আল ফুরকান

২৫

নামকরণ

প্রথম আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো এ নামটিও বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং আলামত হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবুও সূরার বিষয়বস্তুর সাথে নামটির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সামনের দিকের আলোচনা থেকে একথা জানা যাবে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার মনে হয়, এ সূরাটিও সূরা মু'মিনূন ইত্যাদি সূরাগুলোর সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ সময়টি হচ্ছে, রসূলের (সা) মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময়। ইবনে জারীর ও ইমাম রাযী যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটি সূরা নিসার ৮ বছর আগে নাযিল হয়। এ হিসেবেও এর নাযিল হবার সময়টি হয় মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়। (ইবনে জারীর, ১৯ খণ্ড, ২৮–৩০ পৃষ্ঠা ও তাফসীরে কবীর, ৬ খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

কুরআন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত এবং তাঁর পেশকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হতো সেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে সত্যের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার খারাপ পরিণামও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষে সূরা মু'মিনূনের মতো মু'মিনদের নৈতিক গুণাবলীর একটি নকশা তৈরি করে সেই মানদণ্ডে যাচাই করে খাঁটি ও ভেজাল নির্ণয় করার জন্য সাধারণ মানুষের সামনে রেখে দেয়া হয়েছে। একদিকে রয়েছে এমন চরিত্র সম্পন্ন লোকেরা যারা এ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং আগামীতে যাদেরকে তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে রয়েছে এমন নৈতিক আদর্শ যা সাধারণ আরববাসীদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আরববাসীরা এ দু'টি আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি পছন্দ করবে তার ফায়সালা তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। এটি ছিল একটি নিরব প্রশ্ন। আরবের প্রত্যেকটি অধিবাসীর সামনে এ প্রশ্ন রেখে দেয়া হয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছাড়া বাকি সমগ্র জাতি এর যে জবাব দেয় ইতিহাসের পাতায় তা অম্লান হয়ে আছে।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝١ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝٢

বড়ই বরকত সম্পন্ন[১] তিনি যিনি এ ফুরকান[২] তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন[৩], যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়।[৪] যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক,[৫] যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি,[৬] যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই,[৭] যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাক্‌দীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।[৮]

১. মূলে تَبَارَكَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর পূর্ণ অর্থ এক শব্দে তো দূরের কথা এক বাক্যে বর্ণনা করাও কঠিন। এর শব্দমূলে রয়েছে ب - ر - ك অক্ষরত্রয়। এ থেকে بَرَكَة ও بُرُوك দু'টি ধাতু নিষ্পন্ন হয়। بَرَكَة এর মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা, প্রাচুর্যের ধারণা। আর بُرُوك এর মধ্যে স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, অটলতা ও অনিবার্যতার ধারণা রয়েছে। তারপর এ ধাতু থেকে যখন تَبَارَكَ এর ক্রিয়াপদ তৈরি করা হয় তখন تفاعل এর বৈশিষ্ট হিসেবে এর মধ্যে বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও পূর্ণতার প্রকাশের অর্থ শামিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় চরম প্রাচুর্য, বর্ধমান প্রাচুর্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ের স্থায়ীত্ব। এ শব্দটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে কোন জিনিসের প্রাচুর্য বা তার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য বলা হয়ে থাকে। যেমন কখনো এর অর্থ হয় উচ্চতায় অনেক বেশী এগিয়ে যাওয়া। বলা হয়, تبارکت النخلة অর্থাৎ ওমুক খেজুর গাছটি অনেক উঁচু হয়ে গেছে। আস্‌মায়ী বলেন, এক বন্ধু একটি উঁচু টিলায় উঠে পড়ে এবং নিজের সাথীদেরকে বলতে থাকে تَبَارَكْتُ عَلَيْكُمْ "আমি তোমাদের চাইতে উঁচু হয়ে গেছি।" কখনো মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠত্বে বেশী অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে এ শব্দটি বলা হয়। কখনো একে ব্যবহার করা হয় দয়া ও সমৃদ্ধি পৌঁছানো এবং শুভ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রসরতার জন্য। কখনো এ থেকে পবিত্রতার পূর্ণতা ও চূড়ান্ত বিশুদ্ধতার অর্থ গ্রহণ করা হয়। এর স্থায়িত্ব ও অনিবার্যতার অর্থের অবস্থাও একই। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং পূর্বাপর বক্তব্যই

বলে দেয় কোথায় একে কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে তাকে দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে বুঝা যায়, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য تَبَارَكَ শব্দটি এক অর্থে নয় বরং বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ঃ

এক ঃ মহা অনুগ্রহকারী ও সর্বজ্ঞ। কারণ, তিনি নিজের বান্দাকে ফুরকানের মহান নিয়ামত দান করে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

দুই ঃ বড়ই মর্যাদাশালী ও সম্মানীয়। কারণ, পৃথিবী ও আকাশে তাঁরই রাজত্ব চলছে।

তিন ঃ বড়ই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। কারণ, তাঁর সত্তা সকল প্রকার শির্কের গন্ধমুক্ত। তাঁর সমজাতীয় কেউ নেই। ফলে আল্লাহর সত্তার সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন নজির ও সমকক্ষ নেই। তাঁর কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন নেই। কাজেই তাঁর স্থলাভিষিক্তের জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নেই।

চার ঃ বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। কারণ, সমগ্র রাজত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর ক্ষমতায় অংশীদার হবার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই।

পাঁচ ঃ শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি বিশ্ব–জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টিকারী ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন ১৪ ও আল ফুরকান ১৯ টীকা)

২. অর্থাৎ কুরআন মজীদ। فُرْقَان শব্দটি ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর শব্দমূল হচ্ছে ف – ر – ق অক্ষরত্রয়। এর অর্থ হচ্ছে দু'টি জিনিসকে আলাদা করা। অথবা একই জিনিসের অংশ আলাদা আলাদা হওয়া। কুরআন মজীদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পার্থক্যকারী হিসেবে অথবা যার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে অর্থে। অথবা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিরঞ্জন। অর্থাৎ পৃথক করার ব্যাপারে এর পারদর্শিতা এতই বেশী যেন সে নিজেই পৃথক। যদি একে প্রথম ও তৃতীয় অর্থে নেয়া হয় তাহলে এর সঠিক অনুবাদ হবে মানদণ্ড, সিদ্ধান্তকর জিনিস ও নির্ণায়ক (CRITERION)। আর যদি দ্বিতীয় অর্থে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে পৃথক পৃথক অংশ সম্বলিত এবং পৃথক পৃথক সময়ে আগমনকারী অংশ সম্বলিত জিনিস। কুরআন মজীদকে এ দু'টি দিক দিয়েই আল ফুরকান বলা হয়েছে।

৩. মূলে نَزَّلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হয় ক্রমান্বয়ে ও সামান্য সামান্য করে নাযিল করা। এ মুখবন্ধসূচক বিষয়বস্তুর সম্পর্ক সামনের দিকে ৩২ আয়াত (৩ রুকূ') অধ্যয়নকালে জানা যাবে। সেখানে "এ কুরআন সম্পূর্ণটা একই সময় নাযিল করা হয়নি কেন" মক্কার কাফেরদের এ আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ সাবধান বাণী উচ্চারণকারী এবং গাফিলতি ও ভ্রষ্টতার অশুভ ফলাফলের ভীতি প্রদর্শনকারী। এ ভীতি প্রদর্শনকারী ফুরকানও হতে পারে আবার যে বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করা হয়েছে তিনিও হতে পারেন। শব্দটি এমন ব্যাপক অর্থবোধক যে, উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য হতে পারে। আর প্রকৃত অর্থে যেহেতু উভয়ই এক এবং উভয়কে একই কাজে পাঠানো হয়েছে তাই বলা যায়, উভয় অর্থই এখানে লক্ষ। তারপর সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হবার যে কথা এখানে বলা হয়েছে এ থেকে জানা যায় যে, কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত কোন

একটি দেশের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার জন্য এবং কেবলমাত্র নিজেরই যুগের জন্য নয় বরং ভবিষ্যতের সকল যুগের জন্য। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

"হে মানুষেরা! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।"

–সূরা আল আ'রাফ, ১৫৮ আয়াত

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ـ

"আমার কাছে এ কুরআন পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এটা পৌঁছে যায় তাদের সতর্ক করে দেই।"

–সূরা আল আন'আম, ৯ আয়াত

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ

"আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।"–সূরা সাবা, ২৮ আয়াত

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

"আর আমি তোমাকে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি।"

–সূরা আল আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত

এ বিষয়বস্তুটিকে আরো সুস্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বার বার বর্ণনা করেছেন ঃ بعثت الى الاحمر والاسود "আমাকে সাদা-কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।"

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

"প্রথমে একজন নবীকে বিশেষ করে তাঁর নিজেরই জাতির কাছে পাঠানো হতো এবং আমাকে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।"

–বুখারী ও মুসলিম

وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون ـ

"আমাকে সমস্ত সৃষ্টির কাছে পাঠানো হয়েছে এবং আমার আগমনে নবীদের ধারাবাহিক আগমন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।"–মুসলিম

৫. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে, "আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই জন্য।" অর্থাৎ এটা তাঁরই অধিকার এবং তাঁর জন্যই এটা নির্দিষ্ট। অন্য কারো এ অধিকার নেই এবং এর মধ্যে কারো কোন অংশও নেই।

৬. অর্থাৎ কারো সাথে তার কোন বংশীয় সম্পর্ক নেই এবং কাউকে তিনি দত্তকও নেননি। বিশ্ব-জাহানে এমন কোন সত্তা নেই, আল্লাহর সাথে যার বংশগত সম্পর্ক বা

দত্তক সম্পর্কের কারণে সে মাবুদ হবার অধিকার লাভ করতে পারে। তাঁর সত্তা একান্ত একক। কেউ নেই তাঁর সমজাতীয়। আল্লাহর কোন বংশধর নেই যে, নাউযুবিল্লাহ এক আল্লাহর ঔরস থেকে কোন প্রজন্ম চালু হবে এবং একের পর এক বহু আল্লাহর জন্ম নিতে থাকবে। কাজেই যে মুশরিক সমাজ ফেরেশতা, জিন বা কোন কোন মানুষকে আল্লাহর সন্তান মনে করে তাদেরকে দেবতা ও উপাস্য গণ্য করেছে তারা পুরোপুরি মূর্খ, অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট। এভাবে যারা বংশীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে না হলেও কোন বৈশিষ্টের ভিত্তিতে একথা মনে করে নিয়েছে যে, বিশ্ব–জাহানের প্রভু আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন তারাও নিরেট মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে। "পুত্র করে নেবার" এ ধারণাটিকে যেদিক থেকেই বিশ্লেষণ করা যাবে অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হবে। এর কোন বাস্তব ও ন্যায়সংগত বিষয় হবার প্রশ্নই ওঠে না। যারা এ ধারণাটি উদ্ভাবন বা অবলম্বন করে তাদের নিকৃষ্ট মানসিকতা ইলাহী সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনায় অক্ষম ছিল। তারা এ অমুখাপেক্ষী ও অসমকক্ষ সত্তাকে মানুষের মতো মনে করে, যে একাকীত্ব ও নির্জনতার ভয়ে ভীত হয়ে অন্য কারো শিশুকে কোলে নিয়ে নেয় অথবা স্নেহ–ভালোবাসার আবেগে উদ্বেল হয়ে কাউকে নিজের ছেলে করে নেয় কিংবা সবার পরে কেউ তার উত্তরাধিকারী হবে এবং তার নাম ও কাজকে জীবিত রাখবে তাই দত্তক নেবার প্রয়োজন অনুভব করে। এ তিনটি কারণেই মানুষের মনে দত্তক নেবার চিন্তা জাগে। এর মধ্য থেকে যে কারণটিকেই আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তা অবশ্যই মহামূর্খতা, বেআদবী ও স্বল্পবুদ্ধিতাই প্রমাণ করবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, ৬৬–৬৮ টীকা)

৭. মূলে ملك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি বাদশাহী, রাজত্ব, সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) অর্থে বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহই এ বিশ্ব–জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এবং তাঁর শাসন ক্ষমতায় কারো সমান্যতমও অংশ নেই। একথার স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য ফল এই যে, তাহলে তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। কারণ, মানুষ যাকেই মাবুদে পরিণত করে একথা মনে করেই করে যে, তার কাছে কোন শক্তি আছে যে কারণে সে আমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে এবং আমাদের ভাগ্যের ওপর ভালো–মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে। শক্তিহীন ও প্রভাবহীন সত্তাদেরকে আশ্রয়স্থল করতে কোন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও রাজি হতে পারে না। এখন যদি একথা জানা যায় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া এ বিশ্ব–জাহানে আর কারো কোন শক্তি নেই তাহলে বিনয়–নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য কোন মাথা তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে ঝুঁকবে না, কোন হাতও তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে নজরানা পেশ করার জন্য এগিয়ে যাবে না, কোন কন্ঠও তাঁর ছাড়া আর কারো প্রশংসা গীতি গাইবে না বা কারো কাছে প্রার্থনা করবে না ও ভিক্ষা চাইবে না এবং দুনিয়ার কোন নিরেট মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তিও কখনো নিজের প্রকৃত ইলাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও বন্দেগী করার মতো বোকামী করবে না অথবা কারো স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনাধিকার মেনে নেবে না। "আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য" ওপরের এ বাক্যাংশটি থেকে এ বিষয়বস্তুটি আরো বেশী শক্তি অর্জন করে।

৮. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে যে, "প্রত্যেকটি জিনিসকে একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী রেখেছেন।" অথবা প্রত্যেক জিনিসের জন্য যথাযথ পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِـهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝

লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব উপাস্য তৈরি করে নিয়েছে যারা কোন জিনিস সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট,[৯] যারা নিজেদের জন্যও কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না, যারা না জীবন–মৃত্যু দান করতে পারে আর না মৃতদেরকে আবার জীবিত করতে পারে।[১০]

কিন্তু যে কোন অনুবাদই করা হোক না কেন তা থেকে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না। এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বিশ্ব–জাহানের প্রত্যেকটি জিনিসের কেবল অস্তিত্বই দান করেননি বরং তিনিই প্রত্যেকটি জিনিসকে তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত আকার–আকৃতি, দেহ সৌষ্ঠব, শক্তি, যোগ্যতা, গুণাগুণ, বৈশিষ্ট, কাজ ও কাজের পদ্ধতি, স্থায়িত্বের সময়–কাল, উত্থান ও ক্রমবিকাশের সীমা এবং অন্যান্য যাবতীয় বিস্তারিত বিষয় নির্ধারণ করেছেন। তারপর যেসব কার্য–কারণ, উপায়–উপকরণ ও সুযোগ–সুবিধার বদৌলতে প্রত্যেকটি জিনিস এখানে নিজ পরিসরে নিজের ওপর আরোপিত কাজ করে যাচ্ছে তা বিশ্ব–জগতে তিনিই সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তাওহীদের সমগ্র শিক্ষা এ একটি আয়াতের মধ্যেই ভরে দেয়া হয়েছে। এটি কুরআন মজীদের সর্বাত্মক তাৎপর্যবহ আয়াতগুলোর মধ্যে একটি মহান মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। এর মাত্র কয়েকটি শব্দের মধ্যে এত বিশাল বিষয়বস্তু ভরে দেয়া হয়েছে যে, এর ব্যাপ্তি পরিবেষ্টন করার জন্য পুরোপুরি একটি কিতাব যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا افصح الغلام من بنى عبد المطلب علمه هذه الاية –

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, তাঁর বংশের কোন শিশু যখন কথা বলা শুরু করতো তখন তিনি তাকে এ আয়াতটি শিখিয়ে দিতেন।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ও মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ। আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

এ থেকে জানা যায়, মানুষের মনে তাওহীদের পুরোপুরি ধারণা বসিয়ে দেবার জন্য এ আয়াতটি একটি উত্তম মাধ্যম। প্রত্যেক মুসলমানের সন্তানের শৈশবে যখন বুদ্ধির প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে তখনই তার মন–মগজে শুরুতেই এ নকশাটি বসিয়ে দেয়া উচিত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ
اٰخَرُوْنَ ۛۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ④ وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ
اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ⑤ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ
السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ⑥

যারা নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে, এ ফুরকান একটি মনগড়া জিনিস, যাকে এ ব্যক্তি নিজেই তৈরি করেছে এবং অপর কিছু লোক তার এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে। বড়ই জুলুম[১১] ও ডাহা মিথ্যায় তারা এসে পৌঁছেছে। বলে, এসব পুরাতন লোকদের লেখা জিনিস—যেগুলো এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে এবং তা তাকে সকাল-সাঁঝে শুনানো হয়। হে মুহাম্মাদ! বলো, "একে নাযিল করেছেন তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর রহস্য জানেন।"[১২] আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ার্দ্র।[১৩]

৯. এ শব্দগুলো ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এবং এ থেকে সব ধরনের মনগড়া মাবুদ ও উপাস্য বুঝায়। আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে মানুষ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যেমন ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া, সূর্য, চাঁদ, গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, গাছ-পালা, পশু ইত্যাদি। আবার মানুষ নিজেই কিছু জিনিস থেকে তৈরি করে তাদেরকে মাবুদ ও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যেমন পাথর, কাঠ ও মাটির তৈরি মূর্তি।

১০. বক্তব্যের সার নির্যাস হচ্ছে মহান আল্লাহ তাঁর এক বান্দার কাছে প্রকৃত সত্য কি তা দেখিয়ে দেবার জন্য এ ফুরকান নাযিল করেন কিন্তু লোকেরা তা থেকে গাফেল হয়ে এ গোমরাহিতে লিপ্ত হয়েছে। কাজেই সতর্ককারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে এক বান্দাকে পাঠানো হয়েছে। তিনি লোকদেরকে এ বোকামির অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করবেন। তাঁর প্রতি পর্যায়ক্রমে এ ফুরকান নাযিল করা শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি হককে বাতিল থেকে এবং আসলকে নকল থেকে আলাদা করে দেখিয়ে দেবেন।

১১. অন্য অনুবাদ "বড়ই অন্যায় ও বেইনসাফির কথা"ও হতে পারে।

১২. বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে এ আপত্তিটিই উত্থাপন করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন বৈরী সমাজের একজনও একথা বলেনি যে, শিশুকালে খৃষ্টীয় যাজক বুহাইরার সাথে যখন তোমার দেখা হয়েছিল তখন তার কাছ থেকে এ সমস্ত বিষয় তুমি শিখে নিয়েছিলে। তাদের কেউ একথাও বলেনি যে, যৌবনকালে বাণিজ্যিক সফরে তুমি যখন বাইরে যেতে সে সময় খৃষ্টীয় পাদ্রী ও ইহুদি রাব্বীদের কাছ তেকে তুমি এসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলে। কারণ এসব সফরের অবস্থা তাদের জানা ছিল। তিনি একাকী এসব

সফর করেননি। বরং তাদের নিজস্ব কাফেলার সাথে সফর করেছিলেন। তারা জানতো, এগুলোর সাথে জড়িত করে বাইর থেকে কিছু শিখে আসার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করলে তাদের নিজেদের শহরের হাজার হাজার লোক তাদের মিথ্যুক বলবে। তাছাড়া মক্কার প্রত্যেক সাধারণ লোক জিজ্ঞেস করবে, যদি এসব তথ্য এ ব্যক্তি বারো তেরো বছর বয়সেই বুহাইরা থেকে লাভ করে থাকে অথবা ২৫ বছর বয়সে যখন থেকে তার বাণিজ্যিক সফর শুরু হয় তখন থেকেই লাভ করতে থাকে, তাহলে এ ব্যক্তি তো বাইরে কোথাও থাকতো না, আমাদের এ শহরে আমাদের মধ্যেই বাস করতো, এ অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তার এসব জ্ঞান অপ্রকাশ থাকলো কেমন করে? কখনো তার মুখ থেকে এমন একটি শব্দও বের হলো না কেমন করে যার মাধ্যমে তার এ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটতো? এ কারণেই মক্কার কাফেররা এ ধরনের ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। এটা তারা ছেড়ে দিয়েছিল পরবর্তীকালের আরো বেশী নির্লজ্জ লোকদের জন্য। নবুওয়াত পূর্বকাল সম্পর্কে কোন কথা তারা বলতো না। তাদের কথা ছিল নবুওয়াত দাবীর সময়ের সাথে সম্পর্কিত। তারা বলতো, এ ব্যক্তি তো নিরক্ষর, নিজে পড়াশুনা করে নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। ইতিপূর্বে কিছু শেখেনি। আজ এর মুখ থেকে যেসব কথা বের হচ্ছে চল্লিশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত এগুলোর কোন কথাই সে জানতো না। তাহলে এখন হঠাৎ এসব জ্ঞান আসছে কোথা থেকে? এগুলোর উৎস নিশ্চয়ই আগের যুগের লোকদের কিছু কিতাব। রাতের বেলা চুপিসারে সেগুলো থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করিয়ে লেখানো হয়। কাউকে দিয়ে তার অংশবিশেষ পড়িয়ে এ ব্যক্তি শুনতে থাকে তারপর সেগুলো মুখস্থ করে নিয়ে দিনের বেলা আমাদের শুনিয়ে দেয়। হাদীস থেকে জানা যায়, এ প্রসংগে তারা বেশ কিছু লোকের নামও নিতো। তারা ছিল আহলি কিতাব। তারা লেখাপড়া জানতো এবং মক্কায় বাস করতো। অর্থাৎ আদ্দাস (হুওয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্যার আজাদকৃত গোলাম), ইয়াসার (আলা আল-হাদরামির আজাদ করা গোলাম) এবং জাবর (আমের ইবনে রাবী'আর আজাদকৃত গোলাম)।

আপাতদৃষ্টিতে এটা বড়ই শক্তিশালী অভিযোগ মনে হয়। অহীর দাবী নাকচ করার জন্য নবী কোথা থেকে জ্ঞান অর্জন করেন তা চিহ্নিত করার চাইতে বড় ওজনদার আপত্তি আর কি হতে পারে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে মানুষ এ ব্যাপারটি দেখে অবাক হয়ে যায় যে, এর জবাবে আদৌ কোন যুক্তিই পেশ করা হয়নি বরং কেবলমাত্র একথা বলেই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের প্রতি জুলুম করছো, পরিষ্কার বেইনসাফির কথা বলছো, ডাহা মিথ্যার বেসাতি করছো। এতো এমন আল্লাহর কালাম যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন রহস্য জানেন। এ ধরনের কঠোর বিরোধিতার পরিবেশে এমনিতর কঠিন অভিযোগ পেশ করা হয় এবং তাকে এভাবে তাচ্ছিল্যভরে রদ করে দেয়া হয়, এটা কি বিস্ময়কর নয়? সত্যিই কি এটা এমনি ধরনের তুচ্ছ ও নগণ্য অভিযোগ ছিল? এর জবাবে কি শুধুমাত্র "মিথ্যা ও জুলুম" বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল? এ সংক্ষিপ্ত জবাবের পর সাধারণ মানুষ আর কোন বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট জবাবের দাবী করেনি, নতুন মু'মিনদের মনেও কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি এবং বিরোধীদের কেউও একথা বলার হিম্মত করেনি যে, দেখো, আমাদের এ শক্তিশালী অভিযোগের জবাব দিতে পারছে না, নিছক "মিথ্যা ও জুলুম" বলে একে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, এর কারণ কি?

ইসলাম বিরোধীরা যে পরিবেশে এ অভিযোগ করেছিল সেখানেই আমরা এ সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবো ঃ

প্রথম কথা ছিল, মক্কার যেসব জালেম সরদার মুসলমানদের মারপিট করছিল ও কষ্ট দিচ্ছিল তারা যেসব লোক সম্পর্কে বলতো যে, তারা পুরাতন কিতাব থেকে অনুবাদ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুখস্থ করাচ্ছে তাদের গৃহ এবং নবীর (সা) গৃহ অবরোধ করে তাদের নিজেদের কথামত এ কাজের জন্য যেসব বই ও কাগজপত্র জমা করা হয়েছিল সেসব আটক করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিল না। ঠিক যে সময় এ কাজ করা হচ্ছিল তখনই তারা সেখানে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মূল প্রমাণপত্র লোকদের দেখাতে পারতো এবং বলতে পারতো, দেখো, এ তোমাদের নবুওয়াতের প্রস্তুতি চলছে। বেলালকে যারা মরুভূমির তপ্ত বালুর বুকে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে ফিরছিল তাদের পক্ষে এ কাজ করার পথে কোন নিয়ম ও আইন–কানুন বাধ্য ছিল না। এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা চিরকালের জন্য মুহাম্মাদী নবুওয়াতের বিপদ দূর করতে পারতো। কিন্তু তারা কেবল মুখেই অভিযোগ করতে থাকে। কোনদিনও এ ধরনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসেনি।

দ্বিতীয় কথা ছিল, এ প্রসংগে তারা যেসব লোকের নাম নিতো তারা কেউ বাইরের লোক ছিল না। সবাই ছিল এ মক্কা শহরেরই বাসিন্দা। তাদের যোগ্যতা গোপন ছিল না। সামান্য বুদ্ধি–বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও দেখতে পারতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পেশ করছেন তা কোন্ পর্যায়ের, তার ভাষা কত উচ্চ পর্যায়ের, সাহিত্য মর্যাদা কত উন্নত, শব্দ ও বাক্য কেমন শিল্পসমৃদ্ধ এবং সেখানে কত উন্নত পর্যায়ের চিন্তা ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অন্যদিকে মুহাম্মাদ (সা) যাদের থেকে এসব কিছু হাসিল করছেন বলে তারা দাবী করছে তারা কোন্ পর্যায়ের লোক। এ কারণে এ অভিযোগকে কেউই এক কানাকড়ি গুরুত্ব দেয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করতো, এসব কথায় মনের জ্বালা মেটানো হচ্ছে, নয়তো এ কথার মধ্যে সন্দেহ করার মতো একটুও প্রাণশক্তি নেই। যারা এসব লোককে জানতো না তারাও শেষমেষ এতটুকুন কথাও চিন্তা করতে পারতো যে, যদি তারা এতই যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে থাকতো, তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের পাণ্ডিত্যের প্রদীপ জ্বালালো না কেন? অন্য একজনের প্রদীপে তেল যোগান দেবার কি প্রয়োজন তাদের পড়েছিল? তাও আবার চুপিসারে, যাতে এ কাজের খ্যাতির সামান্যতম অংশও তাদের ভাগে না পড়ে?

তৃতীয় কথা ছিল, এ প্রসংগে যেসব লোকের নাম নেয়া হচ্ছিল তারা সবাই ছিল বিদেশাগত গোলাম। তাদের মালিকরা তাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছিল। সেকালের আরবের গোত্রীয় জীবনে কোন ব্যক্তিও কোন শক্তিশালী গোত্রের সাহায্য–সমর্থন ছাড়া বাঁচতে পারতো না। গোলাম স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরও তার সাবেক মালিকের পৃষ্ঠপোষকতায় বসবাস করতো। তার সাহায্য–সমর্থনই হতো স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গোলামের জীবনের সহায়ক। তখন একথা সুস্পষ্ট ছিল, যদি বলা হয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বদৌলতে নাউযুবিল্লাহ একটি মিথ্যা নবুওয়াতের দোকান চালাচ্ছিলেন, তাহলে এ লোকগুলো তো কোন প্রকার আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্যে এ ষড়যন্ত্রে তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতো না। এমন এক ব্যক্তি যে রাতের বেলা তাদের কাছ থেকে কিছু

কথা শিখে নিতো এবং দিনের বেলা সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর সেগুলো অহী হিসেবে নাযিল হয়েছে বলে পেশ করতো, তার আন্তরিক সহযোগী ও অন্ধ ভক্ত তারা কেমন করে হতে পারতো? তাই তাদের অংশগ্রহণ হতে পারতো কোন লোভ ও স্বার্থের ভিত্তিতে। কিন্তু কোন সচেতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি একথা চিন্তা করতে পারতো যে, এরা নিজেদের পৃষ্ঠপোষকদেরকে নারাজ করে দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ষড়যন্ত্রে শরীক হয়ে গিয়ে থাকবে? কি এমন লোভ হতে পারতো যেজন্য তারা সমগ্র জাতির ক্রোধ ও তিরস্কারের লক্ষবস্তু এবং সমগ্র জাতি যাকে শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে তার সাথে সহযোগিতা করতো এবং এ ধরনের বিপদগ্রস্ত লোকের কাছ থেকে কোন লাভের আশায় নিজের পৃষ্ঠপোষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতো? তারপর তাদের মারধর করে ঐ ব্যক্তির সাথে তাদের ষড়যন্ত্রের স্বীকারোক্তি আদায় করার সুযোগ তাদের পৃষ্ঠপোষকদের তো ছিলই, এটাও চিন্তা করার ব্যাপার ছিল। তারা এ সুযোগ ব্যবহার করেনি কেন? কেনই বা তারা সমগ্র জাতির সামনে তাদের নিজেদের মুখে এ স্বীকৃতি প্রকাশ করেনি যে, তাদের কাছ থেকে শিখে ও জ্ঞান নিয়ে নবুওয়াতের এ দোকান জমজমাট করা হচ্ছে?

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এই যে, তারা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনে এবং সাহাবায়ে কেরাম রসূলের পবিত্র সত্তার প্রতি যে নজিরবিহীন ভক্তি–শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তারাও তার অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক নবুওয়াত তৈরির পেছনে যারা নিজেরাই মাল–মশলা যুগিয়েছে তারাই আবার তার প্রতি ঈমান আনবে এবং প্রাণঢালা শ্রদ্ধা সহকারে ঈমান আনবে এটা কি সম্ভব? আর ধরে নেয়া যাক যদি এটা সম্ভব হয়ে থেকেও থাকে, তাহলে মু'মিনদের জামায়াতে তাদের তো কোন উল্লেখযোগ্য মর্যদা লাভ করা উচিত ছিল। আদ্দাস, ইয়াসার ও জাব্‌রের শক্তির ওপর নির্ভর করে নবুওয়াতের কাজ–কারবার চলবে আর নবীর দক্ষিণ হস্ত হবেন আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদাহ, এটা কেমন করে সম্ভব হলো?

অনুরূপভাবে এ ব্যাপারটিও ছিল বড়ই অবাক করার মতো, যদি কয়েকজন লোকের সহায়তায় রাতের বেলা বসে নবুওয়াতের এ ব্যবসায়ের কাগজ–পত্র তৈরি করা সম্ভব হয়ে থেকে থাকে তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসা, আলী ইবনে আবু তালেব, আবু বকর সিদ্দীক ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিবারাত্রের সহযোগী অন্যান্য লোকদের থেকে তা কিভাবে গোপন থাকতে পারতো? এ অভিযোগের মধ্যে যদি সত্যের সামান্যতম গন্ধও থাকতো, তাহলে এ লোকগুলো কেমন করে এ ধরনের আন্তরিকতা সহকারে নবীর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাঁর সমর্থনে সব ধরনের বিপদ–আপদ ও ক্ষতি কিভাবে বরদাশ্‌ত করলো? এটা কি কোনক্রমেই সম্ভব ছিল? এসব কারণে প্রত্যেক শ্রোতার কাছে এ অভিযোগ এমনিতেই ছিল অর্থহীন ও অযৌক্তিক। তাই কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের জবাব দেবার জন্য কুরআনে একে উদ্ধৃত করা হয়নি বরং একথা বলার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, দেখো, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষেত্রে এরা কেমন অন্ধ হয়ে গেছে এবং কেমন ডাহা মিথ্যা, অন্যায় ও বেইনসাফির আশ্রয় নিয়েছে।

১৩. এখানে এ বাক্যাংশটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ কি অপরূপ দয়া ও ক্ষমার আধার! যারা সত্যকে অপদস্ত করার জন্য এমন সব মিথ্যার পাহাড় সৃষ্টি করে

وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ⑦ اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ⑧

তারা বলে, "এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ায়?[১৪] কেন তার কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয়নি, যে তার সাথে থাকতো এবং (অস্বীকারকারীদেরকে)[১৫] ধমক দিতো? অথবা আর কিছু না হলেও তার জন্য অন্তত কিছু ধন–সম্পদ অবতীর্ণ করা হতো অথবা তার কাছে থাকতো অন্তত কোন বাগান, যা থেকে সে (নিশ্চিন্তে) রুজি সংগ্রহ করতো?"[১৬] আর জালেমরা বলে, " তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত[১৭] ব্যক্তির অনুসরণ করছো।"

তাদেরকেও তিনি অবকাশ দেন এবং তাদের অপরাধের কথা শুনার সাথে সাথেই তাদের ওপর আযাব নাযিল করা আরম্ভ করেন না। এ সাবধান বাণীর সাথে সাথে এর মধ্যে উপদেশেরও একটি দিক আছে। সেটি যেন ঠিক এমনি ধরনের যেমন, "হে জালেমরা! এখনো যদি নিজেদের হিংসা–দ্বেষ থেকে বিরত হও এবং সত্য কথাকে সোজাভাবে মেনে নাও তাহলে আজ পর্যন্ত যা কিছু করতে থেকেছো সবই ক্ষমা করা যেতে পারে।"

১৪. অর্থাৎ প্রথমত মানুষের রসূল হওয়াটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার। আল্লাহর পয়গাম নিয়ে যদি কোন ফেরেশতা আসতো তাহলে না হয় বুঝতাম। কিন্তু একজন রক্ত–মাংসের মানুষ জীবিত থাকার জন্য যে খাদ্যের মুখাপেক্ষী সে কেমন করে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আসে! যাহোক তবুও যদি মানুষকেই রসূল করা হয়ে থাকে তবে তাকে তো অন্তত বাদশাহ ও দুনিয়ার বড় লোকদের মতো উন্নত পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব হওয়া উচিত ছিল। তাকে দেখার জন্য চোখ উন্মুখ হয়ে থাকতো এবং তার দরবারে হাজির হবার সৌভাগ্য হতো অনেক দেন–দরবার ও সাধ্য–সাধনার পর। কিন্তু তা না হয়ে এমন এক জন সাধারণ লোককে কিভাবে পয়গম্বর করে দেয়া হয় যে, বাজারের মধ্যে ঘুরে ঘুরে জুতোর তলা ক্ষয় করতে থাকে? পথ চলতি মানুষ যাকে প্রতিদিন দেখে এবং কোন দিক দিয়েই যার মধ্যে কোন অসাধারণত্বের সন্ধান পায় না, কে তাকে গ্রাহ্য করবে? অন্য কথায় রসূলের প্রয়োজন থাকলে তা সাধারণ মানুষকে পথনির্দেশনা দেবার জন্য ছিল না বরং ছিল বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটাবার এবং ঠাটবাট দেখাবার ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন, ২৬ টীকা)

১৫. অর্থাৎ যদি মানুষকেই নবী করা হয়ে থাকে তাহলে একজন ফেরেশতাকে তার সংগে দেয়া হতো। তিনি সব সময় একটি চাবুক হাতে নিয়ে ঘুরতেন এবং লোকদের

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَٰلَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ⑨

দেখো, কেমন সব উদ্ভট ধরনের যুক্তি তারা তোমার সামনে খাড়া করেছে, তারা এমন বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোন কাজের কথাই তাদের মাথায় আসছে না।[১৮]

বলতেন, "এ ব্যক্তির কথা মেনে নাও, নয়তো এখনই আল্লাহর আযাব বর্ষণ করার ব্যবস্থা করছি।" বিশ্বজাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এক ব্যক্তিকে নবুওয়াতের মহান মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্ব প্রদান করে এমনি একাকী ছেড়ে দেবেন লোকদের গালিগালাজ ও দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খাবার জন্য এটা তো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার।

১৬. এটা যেন ছিল তাদের শেষ দাবী। অর্থাৎ আল্লাহ অন্তত এতটুকুই করতেন যে, নিজের রসূলের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ভালো ব্যবস্থা করে দিতেন। এ কেমন ব্যাপার, আল্লাহর রসূল আমাদের একজন সাধারণ পর্যায়ের ধনী লোকের চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকেন! নিজের খরচ চালাবার মতো ধন–সম্পদ নেই, ফল ফলারি খাবার মতো বাগান নেই একটিও, আবার দাবী করেন তিনি রব্বুল আলামীন আল্লাহর নবী।

১৭. অর্থাৎ পাগল। আরবদের দৃষ্টিতে পাগলামির কারণ ছিল দু'টো। কারো ওপর জিনের ছায়া পড়লে সে পাগল হয়ে যেতো অথবা যাদু করে কাউকে পাগল করা হতো। তাদের দৃষ্টিতে তৃতীয় আরো একটি কারণও ছিল। সেটি ছিল এই যে, কোন দেবদেবীর বিরুদ্ধে কেউ বেআদবী করলে তার অভিশাপ তার ওপর পড়তো এবং তার ফলে সে পাগল হয়ে যেতো। মক্কার কাফেররা প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এ কারণগুলো বর্ণনা করতো। কখনো বলতো, এ ব্যক্তির ওপর কোন জিন চেপে বসেছে। কখনো বলতো, বেচারার ওপর কোন দুশমন যাদু করে দিয়েছে। আবার কখনো বলতো, আমাদের কোন দেবতার সাথে বেআদবী করার খেসারত এ বেচারা ভুগছে। কিন্তু এই সংগে তাঁকে আবার এতটা বুদ্ধিমান ও ধীশক্তি সম্পন্নও মনে করতো যে, এ ব্যক্তি একটি অনুবাদ ভবন কায়েম করেছে এবং সেখানে পুরাতন সব গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে তার অংশবিশেষ বাছাই করে করে মুখস্থ করছে। এছাড়াও তারা তাঁকে যাদুকরও বলতো। অর্থাৎ তিনি নিজে যাদুকরও ছিলেন আবার অন্যের যাদুতে প্রভাবিতও ছিলেন। এর পর আর একটি বাড়তি দোষারোপ এও ছিল যে, তিনি কবিও ছিলেন।

১৮. এ আপত্তি ও অভিযোগগুলোও এখানে মূলত জবাব দেবার জন্য নয় বরং অভিযোগকারীরা হিংসা ও বিদ্বেষে কি পরিমাণ অন্ধ হয়ে গেছে তা বুঝবার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। উপরে তাদের যেসব কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে কোন একটিও গুরুত্বসহকারে আলোচনা করার মতো নয়। তাদের শুধুমাত্র উল্লেখ করাই একথা বলার জন্য যথেষ্ট যে, বিরোধীদের কাছে ন্যায়সংগত যুক্তির অভাব অত্যন্ত প্রকট এবং নেহাতই বাজে ও বস্তাপচা কথার সাহায্যে তার একটি যুক্তি সিদ্ধ ও নীতিগত দাওয়াতের মোকাবিলা করছে। এক ব্যক্তি বলছেন, হে লোকেরা! এই যে শিরকের ওপর তোমরা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি–সভ্যতার বুনিয়াদ কায়েম করে রেখেছো এ তো একটি মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং এর মিথ্যা ও ভ্রান্ত হবার পেছনে এ যুক্তি কাজ করছে। জবাবে শিরকের সত্যতার সপক্ষে কোন যুক্তি পেশ করা হয় না বরং শুধুমাত্র এভাবে একটি

تَبٰرَكَ الَّذِىْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۞ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۞

২য় রুকূ'

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি[১৯] যিনি চাইলে তাঁর নির্ধারিত জিনিস থেকে অনেক বেশী ও উৎকৃষ্টতর জিনিস তোমাকে দিতে পারেন, (একটি নয়) অনেকগুলো বাগান যেগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বড় বড় প্রাসাদ।

আসল কথা হচ্ছে, এরা "সে সময়টিকে"[২০] মিথ্যা বলেছে[২১] এবং যে সে সময়কে মিথ্যা বলে তার জন্য আমি জ্বলন্ত আগুন তৈরি করে রেখেছি।

বিদ্রূপ ধ্বনি উঠানো হয় যে, আরে এ লোকের ওপর তো যাদু করা হয়েছে। তিনি বলছেন, বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা চলছে তাওহীদের ভিত্তিতে এবং এইসব বিভিন্ন সত্য এর সাক্ষ দিচ্ছে। জবাবে বড় গলায় ধ্বনিত হচ্ছে—এ ব্যক্তি যাদুকর। তিনি বলছেন, দুনিয়ায় তোমাদের লাগামহীন উটের মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং তোমাদের রবের কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে, পরবর্তী জীবনে তোমাদের এ জীবনের সমস্ত কাজকর্মের হিসেব দিতে হবে এবং এসব বিবিধ নৈতিক, ঐতিহাসিক এবং যুক্তি ও তথ্যগত বিষয় এ সত্যটি প্রমাণ করছে। জবাবে বলা হচ্ছে, আরে এতো একজন কবি। তিনি বলছেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি সত্যের শিক্ষা নিয়ে এবং সে শিক্ষাটি হচ্ছে এই। জবাবে এ শিক্ষার ওপর কোন আলোচনা সমালোচনা করা হয় না বরং প্রমাণ ছাড়াই একটি দোষারোপ করা হয় এই মর্মে যে, এসব কিছুই কোথাও থেকে নকল করা হয়েছে। নিজের রিসালাতের প্রমাণ স্বরূপ তিনি আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাণী পেশ করছেন। নিজের জীবন ও নিজের চরিত্র ও কার্যাবলী পেশ করছেন এবং তার প্রভাবে তার অনুসারীদের জীবনে যে নৈতিক বিপ্লবের সূচনা হচ্ছিল তাও পেশ করছেন। কিন্তু বিরোধিতাকারীরা এর কোনটিও দেখে না। তারা কেবল জিজ্ঞেস করছে, তুমি খাও কেন? বাজারে চলাফেরা করো কেন? কোন ফেরেশতাকে তোমার আরদালী হিসেবে দেয়া হয়নি কেন? তোমার কাছে কোন অর্থভাণ্ডার বা বাগান নেই কেন? এ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কে এর মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে আজেবাজে ও উদ্ভট কথা বলে চলছে এসব কথা আপনাআপনিই তা প্রমাণ করে দিচ্ছিল।

১৯. এখানে আবার সেই একই تبارك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী বিষয়বস্তু থেকে একথা জানা যাচ্ছে যে, এখানে এর মানে হচ্ছে "বিপুল সম্পদ ও উপকরণাদির অধিকারী," "সীমাহীন শক্তিধর" এবং "কারো কোন কল্যাণ করতে চাইলে করতে পারেন না, এর অনেক উর্ধে।"

২০. মূলে الساعة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ساعة মানে মুহূর্ত ও সময় এবং তার সাথে ال সংযোগ করার ফলে এর অর্থ হয়, সেই নির্দিষ্ট সময় যা আসবে এবং যে সম্পর্কে আমি পূর্বাহ্নেই তোমাকে খবর দিয়েছি। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি একটি পারিভাষিক অর্থে এমন একটি বিশেষ সময়ের জন্য বলা হয়েছে যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, পূর্বের ও পরের সবাইকে নতুন করে জীবিত করে উঠানো হবে, সবাইকে একত্র করে আল্লাহ হিসেব নেবেন এবং সবাইকে তার বিশ্বাস ও কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন।

২১. অর্থাৎ তারা যেসব কথা বলছে তার কারণ এ নয় যে, সত্যিসত্যিই কোন সংগত ভিত্তিতে তাদের মনে এ সন্দেহ জেগেছে যে, কুরআন অন্য কোথাও থেকে নকল করা বাণীর সমষ্টি অথবা তারা যথার্থই ধারণা করে যেসব আজাদ করা গোলামের নাম তারা রটিয়ে থাকে তারাই তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেয় কিংবা তুমি আহার করো ও বাজারে চলাফেরা করো কেবলমাত্র এ জিনিসটিই তোমার রিসালাত মেনে নেবার ব্যাপারে তাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করছে অথবা তোমার সত্যের শিক্ষা মেনে নিতে তারা তৈরিই ছিল কিন্তু তোমার সাথে আরদালী হিসেবে কোন ফেরেশতা ছিল না এবং তোমার জন্য কোন অর্থভাণ্ডারও অবতীর্ণ করা হয়নি শুধুমাত্র এ জন্যই তারা পিছিয়ে গিয়েছে। এগুলোর কোনটিই আসল কারণ নয়। বরং আখেরাত অস্বীকারই হচ্ছে এর আসল কারণ, যা হক ও বাতিলের ব্যাপারে তাদেরকে একেবারেই দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে। এরি ফলশ্রুতিতে তারা আদতে কোন গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা অনুসন্ধানের প্রয়োজনই অনুভব করে না এবং তোমার যুক্তিসংগত দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার জন্য এমনই সব হাস্যকর যুক্তি পেশ করতে উদ্যত হয়েছে। এ জীবনের পরে আর একটি জীবনও আছে যেখানে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে তাদের সমস্ত কার্যকলাপের জবাবদিহি করতে হবে, এ চিন্তা তাদের মাথায় আসেই না। তারা মনে করে, এ দু'দিনের জীবনের পরে সবাইকে মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতে হবে। মূর্তিপূজারীও যেমন মাটিতে মিশে যাবে, তেমনি আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহতে অবিশ্বাসীও। কোন জিনিসেরও কোন পরিণাম ফল নেই। তাহলে মুশরিক হিসেবে মরা এবং তাওহীদবাদী বা নাস্তিক হিসেবে মরার মধ্যে ফারাক কোথায়? তাদের দৃষ্টিতে সত্য ও অসত্যের মধ্যকার ফারাকের যদি কোন প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে তা থাকে এ দুনিয়ার সাফল্য ও ব্যর্থতার দিক দিয়ে, অন্য কোন দিক দিয়ে নয়। এখানে তারা দেখে, কোন বিশ্বাস বা নৈতিক মূলনীতিরও কোন নির্ধারিত ফলাফল নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিটি মনোভাব ও কর্মনীতির ব্যাপারে পূর্ণ সমতা সহকারে এ ফলাফল প্রকাশিত হয় না। নাস্তিক, অগ্নিউপাসক, খৃষ্টান, ইহুদী ও নক্ষত্রপূজারী সবাই ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়। এমন কোন একটি বিশ্বাস নেই যে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একথা বলে যে, এ বিশ্বাস অবলম্বনকারী অথবা তা প্রত্যাখ্যানকারী এ জগতে চিরকাল নিশ্চিত সচ্ছল বা নিশ্চিত অসচ্ছল অবস্থায় থাকে। অসৎকর্মশীল এবং সৎকর্মশীলও এখানে চিরকাল নিজের কর্মকাণ্ডের একই নির্ধারিত ফল ভোগ করে না। একজন অসৎকর্মশীল আরাম আয়েশ করে যাচ্ছে এবং অন্যজন শাস্তি পাচ্ছে। একজন সৎকর্মশীল বিপদসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং অন্যজন সম্মানীয় ও মর্যাদাশালী হয়ে বসে আছে। কাজেই পার্থিব ফলাফলের দিক দিয়ে কোন বিশেষ নৈতিক মনোভাব ও কর্মনীতি সম্পর্কেও আখেরাত অস্বীকারকারীরা তার কল্যাণ বা অকল্যাণ হবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا
مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ
ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ
الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَّهُمْ فِيهَا
مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٦﴾

আগুন যখন দূর থেকে এদের দেখবে[২২] তখন এরা তার ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পাবে। আর যখন এরা শৃংখলিত অবস্থায় তার মধ্যে একটি সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন নিজেদের মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। (তখন তাদের বলা হবে) আজ একটি মৃত্যুকে নয় বরং বহু মৃত্যুকে ডাকো।

এদের বলো, এ পরিণাম ভালো অথবা সেই চিরন্তন জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? সেটি হবে তাদের কর্মফল এবং তাদের সফরের শেষ মনযিল। সেখানে তাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল। তা প্রদান করা হবে তোমার রবের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত একটি অবশ্য পালনীয় প্রতিশ্রুতি।[২৩]

হতে পারে না। এহেন পরিস্থিতিতে যখন কোন ব্যক্তি তাদেরকে একটি বিশ্বাস ও একটি নৈতিক নিয়ম শৃংখলার দিকে আহবান জানায় তখন সে যতই গুরুগম্ভীর ও ন্যায়সংগত যুক্তির সাহায্যে নিজের দাওয়াত পেশ করুক না কেন একজন আখেরাত অস্বীকারকারী কখনো গুরুত্ব সহকারে তা বিবেচনা করবে না বরং বালসুলভ ওজর–আপত্তি জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করবে।

২২. আগুন কাউকে দেখবে–একথাটা সম্ভবত রূপক অর্থে বলা হয়েছে। যেমন আমরা বলি, ঐ জামে মসজিদের মিনার তোমাকে দেখছে। আবার এটা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো চেতনাহীন হবে না বরং ভালোভাবে দেখে শুনে জ্বালাবে।

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে وعدا مسئولا অর্থাৎ এমন প্রতিশ্রুতি যা পূর্ণ করার দাবী করা যেতে পারে। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, জান্নাতের এ প্রতিশ্রুতি ও জাহান্নামের এ ভীতি প্রদর্শন এমন এক ব্যক্তির ওপর কি প্রভাব ফেলতে পারে যে পূর্ব থেকেই কিয়ামত, শেষ বিচারের দিন এবং জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করে না? এদিক দিয়ে বিচার করলে বাহ্যত এটি পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে অসংগতিশীল একটি বাণী বলে মনে হবে। কিন্তু একটু

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

আর সেদিনই (তোমার রব) তাদেরও ঘিরে আনবেন এবং তাদের উপাস্যদেরও[২৪] আল্লাহকে বাদ দিয়ে আজ তারা যাদের পূজা করছে। তারপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, " তোমরা কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছিলে? অথবা এরা নিজেরাই সহজ সরল সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল?"[২৫]

গভীরভাবে চিন্তা করলে একথাটা সহজেই বোধগম্য হবে। ব্যাপার যদি এমন হয় যে, আমি একটি কথা স্বীকার করাতে চাই এবং অন্যজন তা স্বীকার করতে চায় না, তাহলে এক্ষেত্রে আলোচনা ও বিতর্কের ধরন হবে এক রকম। কিন্তু যদি আমি নিজের শ্রোতার সাথে এমনভাবে আলাপ করতে থাকি যে, আমার কথা মানা না মানার ব্যাপারটা আলোচ্য নয় বরং শ্রোতার স্বার্থ ও লাভক্ষতিই হচ্ছে আলোচ্য বিষয়, তাহলে এক্ষেত্রে শ্রোতা যতই হঠকারী হোক না কেন একবার অবশ্যই চিন্তা করতে বাধ্য হবে। এখানে কথা বলার ও বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য এ দ্বিতীয় ভংগীটিই অবলম্বিত হয়েছে। এ অবস্থায় শ্রোতাকে তার নিজের কল্যাণের জন্য একথা ভাবতে হয় যে, পরকালীন জীবন অনুষ্ঠিত হবার প্রমাণ যদি নাই বা থাকে তাহলে তার অনুষ্ঠিত না হবারও তো কোন প্রমাণ নেই। আর সম্ভাবনা উভয়টিরই আছে। এখন যদি পরকালীন জীবন না থেকে থাকে, যেমনটি আমরা মনে করছি, তাহলে আমাদেরও মরে মাটির সাথে মিশে যেতে হবে এবং পরকালীন জীবন স্বীকারকারীদেরও। এ অবস্থায় উভয়ে সমান পর্যায়ে অবস্থান করবে। কিন্তু যদি এ ব্যক্তি যে কথা বলছে তা-ই সত্য হয়ে যায় তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের বাঁচোয়া নেই। এভাবে এ বাচনভংগী শ্রোতার হঠকারিতার দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে দেয়। এ ফাটল আরো বেশী বেড়ে যায় যখন কিয়ামত, শেষ বিচার, হিসেব-নিকেশ, দোজখ ও বেহেশতের এমন বিস্তারিত নক্শা পেশ করা হয় যেমন কেউ সেখানকার স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবলী বর্ণনা করছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, হা-মীম আস্ সাজদাহ্, ৫২ আয়াত, ৬৯ টীকা এবং আল আহকাফ, ১০ আয়াত।)

২৪. সামনের দিকের আলোচনা স্বতই প্রকাশ করছে যে, এখানে উপাস্য বলতে মূর্তি নয় বরং ফেরেশতা, নবী, রসূল, শহীদ ও সৎলোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। বিভিন্ন জাতির মুশরিক সম্প্রদায় তাদেরকে উপাস্যে পরিণত করে রেখেছে। আপাতদৃষ্টিতে এক ব্যক্তি وما يعبدون শব্দাবলী পড়ে এর অর্থ মূর্তি বলে মনে করে। কেননা, আরবী ভাষায় সাধারণত ما শব্দটি নিষ্প্রাণ ও নির্বোধ জীবের জন্য এবং مَنْ শব্দটি বুদ্ধিমান জীবের জন্য বলা হয়ে থাকে। আমরা যেমন অনেক সময় কোন মানুষ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যভরে বলি "সে কি" এবং এ থেকে এ অর্থ গ্রহণ করি যে, তার কোন সামান্যতমও মর্যাদা নেই, সে কোন বিরাট বড় ব্যক্তিত্ব নয়। ঠিক আরবী ভাষাতেও তেমনি বলা হয়ে থাকে। যেহেতু আল্লাহর মোকাবিলায় তাঁর সৃষ্টিকে উপাস্যে পরিণত করার ব্যাপার এখানে বক্তব্য আসছে, তাই ফেরেশতাদের ও বড় বড় মনীষীদের মর্যাদা যতই উচ্চতর হোক না কেন আল্লাহর

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

তারা বলবে, "পাক–পবিত্র আপনার সত্তা! আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করার ক্ষমতাও তো আমাদের ছিল না কিন্তু আপনি এদের এবং এদের বাপ–দাদাদের খুব বেশী জীবনোপকরণ দিয়েছেন, এমনকি এরা শিক্ষা ভুলে গিয়েছে এবং দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়েছে।[২৬] এভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে তারা (তোমাদের উপাস্যরা) তোমাদের কথাগুলোকে যা আজ তোমরা বলছো,[২৭] তারপর না তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ঠেকাতে পারবে, না পারবে কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে–ই জুলুম করবে [২৮] তাকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো।

মোকাবিলায় তা যেন কিছুই নয়। এজন্যই পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে مَن এর পরিবর্তে مَا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২৫. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুটি এসেছে। যেমন সূরা সাবার ৪০–৪১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ○ قَالُوا سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ○

"যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন, এরা কি তোমাদেরই বন্দেগী করতো? তারা বলবে ঃ পাক–পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে নয়। এরা তো জিনদের (অর্থাৎ শয়তান) ইবাদাত করতো। এদের অধিকাংশই তাদের প্রতিই ঈমান এনেছিল।"

অনুরূপভাবে সূরা মায়েদার শেষ রুকূ'তে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে যে রসূলই আমি পাঠিয়েছি তারা সবাই আহার করতো ও বাজারে চলাফেরা করতো।[২৯] আসলে আমি তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার মাধ্যমে পরিণত করেছি।[৩০] তোমরা কি সবর করবে?[৩১] তোমাদের রব সবকিছু দেখেন।[৩২]

بِحَقٍّ ...... مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ

"আর যখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, হে মারয়ামের ছেলে ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্যে পরিণত করো? সে বলবে, পাক–পবিত্র আপনার সত্তা, যে কথা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য কবে শোভন ছিল?...............আমি তো এদেরকে এমন সব কথা বলেছিলাম যা বলার হুকুম আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব।"

২৬. অর্থাৎ তারা ছিল সংকীর্ণমনা ও নীচ প্রকৃতির লোক। তিনি রিযিক দিয়েছিলেন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু তারা সবকিছু খেয়েদেয়ে নিমকহারাম হয়ে গেছে এবং তাঁর প্রেরিত নবীগণ তাদেরকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তা ভুলে গেছে।

২৭. অর্থাৎ তোমাদের এ ধর্ম যাকে তোমরা সত্য মনে করে বসেছো তা একেবারেই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে এবং তোমাদের যে উপাস্যদের ওপর তোমাদের বিপুল আস্থা, তোমরা মনে করো তারা হবে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী তারাই উলটো তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তোমরা নিজেদের উপাস্যদের যাইকিছু গণ্য করেছো তা সব তোমাদের নিজেদেরই কার্যক্রম, তাদের কেউ তোমাদের একথা বলেনি যে, তাদের এভাবে মেনে চলতে হবে এবং তাদের জন্য এভাবে নয্‌রানা দিতে হবে আর তাহলে তারা আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য সুপারিশ করার দায়িত্ব নিয়ে নেবে। কোন ফেরেশতা বা কোন মনীষীর পক্ষ থেকে এমনি ধরনের কোন উক্তি এখানে তোমাদের কাছে নেই। এ কথা তোমরা কিয়ামতের দিন প্রমাণও করতে পারবে না। বরং তারা সবাই তোমাদের চোখের সামনে এসব কথার প্রতিবাদ করবে এবং তোমরা নিজেদের কানে সেসব প্রতিবাদ শুনবে।

২৮. এখানে জুলুম বলতে সত্য ও ন্যায়ের ওপর জুলুম বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুফরী ও শিরক। পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, নবীকে অস্বীকারকারী, আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের উপাসনাকারী এবং আখেরাত অস্বীকারকারীদের "জুলুম"কারী গণ্য করা হচ্ছে।

২৯. মক্কার কাফেরদের এ বক্তব্য যে, এ কেমন রসূল যে আহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে, এর জবাবে একথা বলা হয়েছে। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, মক্কার কাফেররা হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাইল (আ), হযরত মূসা (আ) এবং অন্যান্য বহু নবী সম্পর্কে কেবল যে জানতো তা নয় বরং তাদের রিসালাতও স্বীকার করতো। তাই বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এ অভিনব আপত্তি জানানো হচ্ছে কেন? ইতিপূর্বে এমন কোন্ নবী এসেছেন যিনি আহার করতেন না ও বাজারে চলাফেরা করতেন না? অন্যদের কথা দূরে থাক, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, যাকে খৃষ্টানরা আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেছে (এবং যার মূর্তি মক্কার কাফেররাও কাবাগৃহের মধ্যে স্থাপন করেছিল) তিনিও ইনজীলের বর্ণনা অনুযায়ী আহারও করতেন এবং বাজারে চলাফেরাও করতেন।

৩০. অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা রসূল ও মু'মিনদের জন্য পরীক্ষা এবং রসূল ও মু'মিনরা অস্বীকারকারীদের জন্য। অস্বীকারকারীরা জুলুম, নিপীড়ন ও জাহেলী শত্রুতার যে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছে সেটিই এমন একটি মাধ্যম যা থেকে প্রমাণ হবে রসূল ও তাঁর সাচ্চা ঈমানদার অনুসারীরা খাঁটি সোনা। যার মধ্যে ভেজাল থাকবে সে সেই আগুনের কুণ্ড নিরাপদে অতিক্রম করতে পারবে না। এভাবে নির্ভেজাল ঈমানদারদের একটি ছাঁটাই বাছাই করা গ্রুপ বের হয়ে আসবে। তাদের মোকাবিলায় এরপর দুনিয়ার আর কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারবে না। এ আগুনের কুণ্ড জ্বলতে না থাকলে সবরকমের খাঁটি ও ভেজাল লোক নবীর চারদিকে জমা হতে থাকবে এবং দীনের সূচনাই হবে একটি অপরিপক্ক দল থেকে। অন্যদিকে অস্বীকারকারীদের জন্যও রসূল ও রসূলের সাহাবীগণ হবেন একটি পরীক্ষা। নিজেদেরই বংশ-গোত্রের মধ্য থেকে একজন সাধারণ লোককে হঠাৎ নবী বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া, তাঁর অধীনে কোন বিরাট সেনাদল ও ধন-সম্পদ না থাকা, আল্লাহর বাণী ও নির্মল চরিত্র ছাড়া তাঁর কাছে বিস্ময়কর কিছু না থাকা, বেশীরভাগ গরীব-মিসকীন, গোলাম ও নব্য কিশোর যুবাদের তাঁর প্রাথমিক অনুসারী দলের অন্তরভুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর এ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে যেন নেকড়ে ও হায়েনাদের মধ্যে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয়া— এ সবই হচ্ছে এমন একটি ছাঁকনি যা অসৎ ও অনভিপ্রেত লোকদের দীনের দিকে আসতে বাধা দেয় এবং কেবলমাত্র এমন সব লোককে ছাঁটাই বাছাই করে সামনের দিকে নিয়ে চলে যারা সত্যকে জানে, চেনে ও মেনে চলে। এ ছাঁকনি যদি না বসানো হতো এবং রসূল বিরাট শান-শওকতের সাথে এসে সিংহাসনে বসে যেতেন, অর্থভাণ্ডারের মুখ তাঁর অনুসারীদের জন্য খুলে দেয়া হতো এবং সবার আগে বড় বড় সরদার ও সমাজপতির অগ্রসর হয়ে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করতো, তাহলে দুনিয়া পূজারী ও স্বার্থবাদী মানুষদের মধ্যে তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর অনুগত ভক্তের দলে শামিল হতো না এমন নির্বোধ কোন লোক পাওয়া সম্ভব ছিল কি? এ অবস্থায় তো সত্যপ্রিয় লোকেরা সবার পেছনে থেকে যেতো এবং বৈষয়িক স্বার্থ পূজারীরা এগিয়ে যেতো।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَآ إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

৩ রুকূ'

যারা আমার সামনে হাজির হবার আশা করে না তারা বলে, "কেন আমাদের কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না?৩৩ অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন?৩৪ বড়ই অহংকার করে তারা নিজেদের মনে মনে৩৫ এবং সীমা অতিক্রম করে গেছে তারা অবাধ্যতায়। যেদিন তারা ফেরেশতাদের দেখবে সেটা অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদের দিন হবে না।৩৬ চিৎকার করে উঠবে তারা, "হে আল্লাহ! বাঁচাও, বাঁচাও" এবং তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিয়ে আমি ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবো।৩৭

৩১. অর্থাৎ এ কল্যাণকর উপযোগিতাটি উপলব্ধি করার পর এখন কি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারছো? যে কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করছো তার জন্য পরীক্ষার এ অবস্থার অতীব প্রয়োজন বলে কি তোমরা মনে করছো? এ পরীক্ষার সময় যেসব অবধারিত আঘাত লাগবে সেগুলোর মুখোমুখি হতে কি এখন তোমরা প্রস্তুত?

৩২. এর দু'টি অর্থ এবং সম্ভবত এখানে দু'টিই প্রযোজ্য। এক, তোমাদের রব যা কিছু করছেন দেখে–শুনেই করছেন। তাঁর দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে কোন অন্যায়, বেইনসাফী ও গাফলতি নেই। দুই, যে ধরনের আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠা নিয়ে তোমরা এ কঠিন কাজটি করছো তাও তোমাদের রবের চোখের সামনে আছে এবং যে ধরনের জুলুম, নির্যাতন ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তোমাদের কল্যাণ প্রচেষ্টার মোকাবিলা করা হচ্ছে তাও তাঁর অগোচরে নেই। কাজেই তোমাদের নিজেদের কাজের মর্যাদালাভ থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে না এবং নিজেদের জুলুম ও বাড়াবাড়ির বিপদ থেকেও নিস্কৃতি পাবে না, এ ব্যাপারে তোমরা পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকো।

৩৩. অর্থাৎ যদি সত্যিই আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে থাকে আমাদের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছাবেন, তাহলে একজন নবীকে মাধ্যমে পরিণত করে তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো যথেষ্ট নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একজন করে ফেরেশতা পাঠানো উচিত। ফেরেশতা এসে তাকে বলবে, তোমার রব তোমার কাছে এ পয়গাম পাঠাচ্ছেন। অথবা ফেরেশতাদের একটি প্রতিনিধিদল প্রকাশ্য জনসমাবেশে সবার সামনে এসে যাবে এবং সবাইকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে দেবে। সূরা আন'আমেও তাদের এ আপত্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে ঃ

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۨالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۭ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

সেদিন যারা জান্নাতের অধিকারী হবে তারাই উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করবে এবং দুপুর কাটাবার জন্য চমৎকার জায়গা পাবে।[৩৮] আকাশ ফুঁড়ে একটি মেঘমালার সেদিন উদয় হবে এবং ফেরেশতাদের দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে। সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে শুধুমাত্র দয়াময়ের[৩৯] এবং সেটি হবে অস্বীকারকারীদের জন্য বড়ই কঠিন দিন।

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ -

"যখন কোন আয়াত তাদের সামনে পেশ হতো, তারা বলতো আমরা কখ্খনো মেনে নেবো না যতক্ষণ না আমাদের সেসব কিছু দেয়া হবে যা আল্লাহর রসূলদের দেয়া হয়েছে। অথচ আল্লাহই ভালো জানেন কিভাবে তাঁর পয়গাম পৌঁছাবার ব্যবস্থা করবেন।" (১২৪ আয়াত)

৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ নিজে আসবেন এবং বলবেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের কাছে এ হচ্ছে আমার অনুরোধ।

৩৫. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "নিজেদের জ্ঞানে তারা নিজেদেরকে অনেক বড় কিছু মনে করে নিয়েছে।"

৩৬. এ একই বিষয়বস্তু সূরা আন'আমের ৮ আয়াতে এবং সূরা হিজ্‌রের ৭–৮ এবং ৫১–৬৪ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও সূরা বনী ইসরাঈলের ৯০ থেকে ৯৫ পর্যন্ত আয়াতেও কাফেরদের অনেকগুলো অদ্ভূত ও অভিনব দাবীর সাথে এগুলোর উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়েছে।

৩৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম ৩৫ ও ৩৬ টীকা।

৩৮. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে জান্নাতের হকদার লোকদের সাথে অপরাধীদের থেকে ভিন্নতর ব্যবহার করা হবে। তাদের সম্মানের সাথে বসানো হবে। হাশরের দিনের কঠিন দুপুর কাটাবার জন্য তাদের আরাম করার জায়গা দেয়া হবে। সেদিনের সবরকমের কষ্ট ও কঠোরতা হবে অপরাধীদের জন্য। সৎকর্মশীলদের জন্য নয়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝

জালেমরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, "হায়! যদি আমি রসূলের সহযোগী হতাম। হায়! আমার দুর্ভাগ্য, হায়! যদি আমি অমুক লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনার কারণে আমার কাছে আসা উপদেশ আমি মানিনি। মানুষের জন্য শয়তান বড়ই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।"[৪০] আর রসূল বলবে, " হে আমার রব! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা এ কুরআনকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষবস্তুতে পরিণত করেছিল।"[৪১]

والذى نفسى بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلوة مكتوبة يصليها فى الدنيا

"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আবদ্ধ, কিঁয়ামতের মহা ও ভয়াবহ দিবস একজন মু'মিনের জন্য অনেক সহজ করে দেয়া হবে। এমনকি তা এতই সহজ করে দেয়া হবে, যেমন একটি ফরয নামায পড়ার সময়টি হয়।" (মুসনাদে আহমদ, আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত)

৩৯. অর্থাৎ যে সমস্ত নকল রাজত্ব ও রাজ্যশাসন দুনিয়ায় মানুষকে প্রতারিত করে তা সবই খতম হয়ে যাবে। সেখানে কেবলমাত্র একটি রাজত্বই বাকি থাকবে এবং তা হবে এ বিশ্ব-জাহানের যথার্থ শাসনকর্তা আল্লাহর রাজত্ব। সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ هُمْ بَرِزُوْنَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

"সেদিন যখন এরা সবাই প্রকাশ হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে এদের কোন জিনিস গোপন থাকবে না, জিজ্ঞেস করা হবে—আজ রাজত্ব কার? সবদিক থেকে জবাব আসবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি সবার ওপর বিজয়ী।" (১৬ আয়াত)

হাদীসে এ বিষয়বস্তুকে আরো বেশী স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ এক হাতে পৃথিবী ও অন্য হাতে আকাশ নিয়ে বলবেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝

হে মুহাম্মাদ! আমি তো এভাবে অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শক্রতে পরিণত করেছি[৪২] এবং তোমার জন্য তোমার রবই পথ দেখানোর ও সাহায্য দানের জন্য যথেষ্ট।[৪৩]

অস্বীকারকারীরা বলে, "এ ব্যক্তির কাছে সমগ্র কুরআন একই সাথে নাযিল করা হলো না কেন?"[৪৪] —হ্যাঁ, এমন করা হয়েছে এজন্য, যাতে আমি একে ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে দিতে থাকি[৪৫] এবং (এ উদ্দেশ্যে) একে একটি বিশেষ ক্রমধারা অনুযায়ী আলাদা আলাদা অংশে সাজিয়ে দিয়েছি।

انـا الـملـك ، انـا الـديان ، ايـن مـلوك الارض ؟ ايـن الـجبارون ؟ ايـن المـتكبرون ؟

"আমিই বাদশাহ, আমিই শাসনকর্তা। এখন সেই পৃথিবীর বাদশাহরা কোথায়? কোথায় স্বৈরাচারী একনায়কের দল? অহংকারী ক্ষমতাদর্পীরা কোথায়? (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে সামান্য শাব্দিক হেরফের সহকারে এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

৪০. এটিও কাফেরদের উক্তির একটি অংশ হতে পারে। আবার এও হতে পারে যে, তাদের উক্তির উপর এটি আল্লাহর নিজের উক্তি। দ্বিতীয় অবস্থায় এর যথার্থ উপযোগী অনুবাদ হবে, "আর ঠিক সময়ে মানুষকে প্রতারণা করার জন্য শয়তান তো আছেই।"

৪১. মূল শব্দ مهجورا –এর কয়েকটি অর্থ হয়। যদি একে هجر থেকে গঠিত ধরা হয় তাহলে অর্থ হবে পরিত্যক্ত। অর্থাৎ তারা কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে বলে মনেই করেনি, তাকে গ্রহণ করেনি এবং তার থেকে কোনভাবে প্রভাবিতও হয়নি। আর যদি একে هجر থেকে গঠিত ধরা হয় তাহলে এর দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ এক, তারা একে প্রলাপ ও অর্থহীন বাক্য মনে করেছে। দুই, তারা একে নিজেদের প্রলাপ ও অর্থহীন বাক্য প্রয়োগের লক্ষস্থলে পরিণত করেছে এবং একে নানান ধরনের বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থেকেছে।

৪২. অর্থাৎ আজ তোমার সাথে যে শক্রতা করা হচ্ছে এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। আগেও এমনটি হয়ে এসেছে। যখনই কোন নবী সত্য ও সততার দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তখনই অপরাধজীবী লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে আদাপানি খেয়ে লেগেছে। এ বিষয়বস্তুটি সূরা আন'আমের ১১২–১১৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

আর "আমি তাদের শত্রুতে পরিণত করে দিয়েছি।" মর্মে যে কথাটি বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আমার প্রাকৃতিক আইন এ রকমই। কাজেই আমার এ ইচ্ছার ওপর সবর করো এবং প্রাকৃতিক আইনের আওতায় যেসব অবস্থার সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য ঠাণ্ডা মাথায় দৃঢ় সংকল্প সহকারে সেগুলোর মোকাবিলা করতে থাকো। একদিকে তুমি সত্যের দাওয়াত দেবার সাথে সাথেই দুনিয়ার বিরাট অংশ তা গ্রহণ করার জন্য দৌড়ে আসবে এবং সকল দুষ্কৃতকারী নিজের যাবতীয় দুষ্কৃতি ত্যাগ করে সত্যের দাওয়াতকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরবে এমনটি আশা করো না।

৪৩. পথ দেখানো অর্থ কেবলমাত্র সত্যজ্ঞান দান করাই নয় বরং ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যের সাথে চালানো এবং শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ করার জন্য যথাসময়ে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পথও দেখিয়ে দেয়া বুঝায়। আর সাহায্য মানে হচ্ছে সব ধরনের সাহায্য। যতগুলো ময়দানে হক ও বাতিলের সংঘাত হয় তার প্রত্যেকটিতে হকের সমর্থনে সাহায্য পৌঁছানো আল্লাহর কাজ। যুক্তির লড়াই হলে তিনিই সত্যপন্থীদেরকে সঠিক ও পূর্ণশক্তিশালী যুক্তি সরবরাহ করেন। নৈতিকতার লড়াই হলে তিনিই সবদিক থেকে সত্যপন্থীদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। সংগঠন–শৃংখলার মোকাবিলা হলে তিনিই বাতিলপন্থীদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন এবং হকপন্থীদের হৃদয় সংযুক্ত করেন। মানবিক শক্তির মোকাবিলা হলে তিনিই প্রতিটি পর্যায়ে যোগ্য ও উপযোগী ব্যক্তিবর্গ ও গ্রুপসমূহ সরবরাহ করে হকপন্থীদের দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বস্তুগত উপকরণের প্রয়োজন হলে তিনিই সত্যপন্থীদের সামান্য ধন ও উপায়–উপকরণে এমন বরকত দান করেন যার ফলে বাতিলপন্থীদের উপকরণের প্রাচুর্য তার মোকাবিলায় নিছক একটি প্রতারণাই প্রমাণিত হয়। মোটকথা সাহায্য দেয়া ও পথ দেখানোর এমন কোন দিক নেই যেখানে সত্যপন্থীদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট নন এবং তাদের অন্য কারো সাহায্য–সহায়তা নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, আল্লাহর তাদের জন্য যথেষ্ট হওয়ার ওপর তাদের বিশ্বাস ও আস্থা থাকতে হবে এবং তারা কোন প্রকার প্রচেষ্টা না চালিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারবে না। বরং তৎপরতা সহকারে বাতিলের মোকাবিলায় হকের মাথা উঁচু রাখার জন্য লড়ে যেতে হবে।

একথা মনে রাখতে হবে, আয়াতের এ দ্বিতীয় অংশটি না হলে প্রথম অংশ হতো বড়ই হতাশাব্যঞ্জক। এক ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে, আমি জেনে বুঝে তোমাকে এমন একটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছি যা শুরু করার সাথে সাথেই দুনিয়ার যত কুকুর ও নেকড়ে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—এর চেয়ে বড় উৎসাহ ভংগকারী জিনিস তার জন্য আর কী হতে পারে! কিন্তু এ ঘোষণার সমস্ত ভীতি এ সান্ত্বনাবাণী শুনে দূর হয়ে যায় যে, এ প্রাণান্তকর সংঘাতের ময়দানে নামিয়ে দিয়ে তোমাকে আমি একাকী ছেড়ে দেইনি বরং তোমার সাহায্যার্থে আমি নিজেই রয়েছি। অন্তরে ঈমান থাকলে এর চেয়ে বেশী সাহস সঞ্চারী কথা আর কি হতে পারে যে, সারা বিশ্ব–জাহানের মালিক আল্লাহ নিজেই আমাদের সাহায্যদান ও পথ দেখাবার দায়িত্ব নিচ্ছেন। এরপর তো শুধুমাত্র একজন হতোদ্যম কাপুরুষই ময়দানে এগিয়ে যেতে ইতস্তত করতে পারে।

৪৪. এই আপত্তিটাই ছিল মক্কার কাফেরদের খুবই প্রিয় ও যুৎসই। তাদের মতে এ আপত্তিটি ছিল খুবই শক্তিশালী। এজন্যে বারবার তারা এর পুনরাবৃত্তি করতো। কুরআনেও

বিভিন্ন স্থানে এটি উদ্ধৃত করে এর জবাব দেয়া হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নমল ১০১–১০৬ ও বনী ইসরাঈল ১১৯ টীকা) তাদের প্রশ্নের অর্থ ছিল, যদি এ ব্যক্তি নিজে চিন্তা–ভাবনা করে অথবা কারো কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে এবং বিভিন্ন কিতাব থেকে নকল করে এসব বিষয়বস্তু না এনে থাকে বরং যদি সত্যিসত্যিই এটি আল্লাহর কিতাব হয়, তাহলে সমগ্র কিতাবটি একই সময় একই সংগে নাযিল হচ্ছে না কেন? আল্লাহ যা বলতে চান তা তো তিনি ভালো করেই জানেন। যদি তিনি এগুলোর নাযিলকারী হতেন তাহলে সব কথা এক সাথেই বলে দিতেন। এই যে চিন্তা–ভাবনা করে বিভিন্ন সময় কিছু কিছু বিষয় আনা হচ্ছে এগুলো একথার সুস্পষ্ট আলামত যে, অহী উপর থেকে নয় বরং এখানেই কোথাও থেকে আহরণ করা হচ্ছে অথবা নিজেই তৈরী করে সরবরাহ করার কাজ চলছে।

৪৫. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "এর মাধ্যমে আমি তোমার অন্তরকে শক্তিশালী করি" অথবা "তোমার বুকে হিম্মত সঞ্চার করি।" শব্দগুলোর মধ্যে উভয় অর্থই রয়েছে এবং উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এভাবে একই বাক্যে কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল করার বহুতর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ স্মৃতির ভাণ্ডারে একে হুবহু ও অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। লেখার আকারে নয় বরং একজন নিরক্ষর নবীর মাধ্যমে নিরক্ষর মানব গোষ্ঠীর মধ্যে মৌখিক ভাষণের আকারে এর প্রচার ও প্রসার হচ্ছে।

দুই ঃ এর শিক্ষাগুলো ভালোভাবে হৃদয়ংগম করা যেতে পারে। এজন্য থেমে থেমে সামান্য সামান্য কথা বলা এবং একই কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করাই বেশী উপযোগী হয়।

তিন ঃ এ কিতাব যে জীবন পদ্ধতির কথা বলেছে তার ওপর মন স্থির হয়ে যেতে থাকে। এজন্য নির্দেশ ও বিধানসমূহ পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়াটাই বেশী যুক্তিসংগত। অন্যথায় যদি সমস্ত আইন–কানুন এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থা একই সংগে বর্ণনা করে তা প্রতিষ্ঠিত করার হুকুম দেয়া হতো তা হলে চেতনা বিশৃংখল হয়ে যেতো। তাছাড়া এটাও বাস্তব সত্য যে, প্রত্যেকটি হুকুম যদি যথাযথ ও উপযুক্ত সময়ে দেয়া হয় তাহলে তার জ্ঞানবত্তা ও প্রাণসত্তা বেশী ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। অন্যদিকে সমস্ত বিধান, ধারা ও উপধারা অনুসারে সাজিয়ে একই সংগে দিয়ে দিলে এ ফল পাওয়া যেতে পারে না।

চার ঃ ইসলামী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে যখন হক ও বাতিলের লাগাতার সংঘাত চলে সে সময় নবী ও তাঁর অনুসারীদের মনে সাহস সঞ্চার করে যেতে হবে। এ জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একবার একটি লম্বা–চওড়া নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিয়ে সারা জীবন সমগ্র দুনিয়ার যাবতীয় বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেবার তুলনায় বার বার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের কাছে পয়গাম আসা বেশী কার্যকর হয়ে থাকে। প্রথম অবস্থায় মানুষ মনে করে সে প্রবল বাত্যা বিক্ষুব্ধ তরংগের মুখে পড়ে গেছে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ অনুভব করে, যে আল্লাহ তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছেন তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। তার কাজে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তার অবস্থা দেখছেন, তার সমস্যা ও সংকটে তাকে পথ দেখাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটি

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾

আর (এর মধ্যে এ কল্যাণকর উদ্দেশ্যও রয়েছে যে) যখনই তারা তোমার সামনে কোন অভিনব কথা (অথবা অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে তার সঠিক জবাব যথাসময়ে আমি তোমাকে দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি।[৪৬]—যাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়া হবে তাদের অবস্থান বড়ই খারাপ এবং তাদের পথ সীমাহীন ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।[৪৭]

প্রয়োজনের সময় তাকে তাঁর সামনে হাজির হবার ও সম্বোধন করার সৌভাগ্য দান করে তার সাথে নিজের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করতে থেকেছেন। এ জিনিসটি তার উৎসাহ বৃদ্ধি এবং সংকল্প সুদৃঢ় করে।

৪৬. এটি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল করার পদ্ধতি অবলম্বনের আর একটি কারণ। কুরআন মজীদ নাযিল করার কারণ এ নয় যে, আল্লাহ "বিধানাবলী" সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করতে চান এবং এর প্রচারের জন্য নবীকে তাঁর এজেন্ট নিয়োগ করেছেন। আসল ব্যাপার যদি এটাই হতো, তাহলে পুরো বইটি লেখা শেষ করে একই সময় এজেন্টের হাতে সম্পূর্ণ বইটি তুলে দেয়ার দাবী যথার্থ হতো। কিন্তু আসলে এর নাযিলের কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কুফরী, জাহিলীয়াত ও ফাসেকীর মোকাবিলায় ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও আল্লাহভীতির একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে চান এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি একজন নবীকে আহবায়ক ও নেতা হিসেবে সামনে এনেছেন। এ আন্দোলন চলাকালে একদিকে যদি তিনি আহবায়ক ও তার অনুসারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও নির্দেশনা দেয়া নিজের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত করে নিয়ে থাকেন তাহলে অন্যদিকে এটাও নিজ দায়িত্বের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছেন যে, বিরোধীরা যখনই কোন আপত্তি বা সন্দেহ অথবা জটিলতা পেশ করবে তখনই তিনি তা পরিষ্কার করে দেবেন এবং যখনই তারা কোন কথার ভুল অর্থ করবে তখনই তিনি তার সঠিক ব্যাখ্যা করে দেবেন। এরূপ রকমারি প্রয়োজনের জন্য যেসব ভাষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হচ্ছে সেগুলোর সমষ্টির নাম কুরআন। এটি কোন আইন, নৈতিকতা বা দর্শনের কিতাব নয় বরং একটি আন্দোলনের কিতাব। আর এর প্রতিষ্ঠার সঠিক প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে তা শুরু হবে এবং শেষ পর্ব পর্যন্ত যেভাবে আন্দোলন চলতে থাকবে এও সাথে সাথে সুযোগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নাযিল হতে থাকবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ৯–২০ পৃষ্ঠা)

৪৭. অর্থাৎ যারা সোজা কথাকে উল্টোভাবে চিন্তা করে এবং উলটো ফলাফল বের করে তাদের বুদ্ধি উল্টোমুখো হয়েছে। এ কারণেই তারা কুরআনের সত্যতা প্রমাণ পেশকারী প্রকৃত সত্যগুলোকে তাদের মিথ্যা হবার প্রমাণ গণ্য করছে। আর এজন্যই তাদেরকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٧﴾

৪ রুকূ'

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম[৪৮] এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে লাগিয়েছিলাম আর তাদের বলেছিলাম, যাও সেই সম্প্রদায়ের কাছে যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে।[৪৯] শেষ পর্যন্ত তাদের আমি ধ্বংস করে দিলাম। একই অবস্থা হলো নূহের সম্প্রদায়েরও যখন তারা রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো,[৫০] আমি তাদের ডুবিয়ে দিলাম এবং সারা দুনিয়ার লোকদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত করলাম, আর এ জালেমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ঠিক করে রেখেছি।[৫১]

৪৮. এখানে কিতাব বলে সম্ভবত তাওরাত নামে পরিচিত গ্রন্থটিকে বুঝানো হচ্ছে না, যা মিসর থেকে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে বের হবার সময় হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। বরং এখানে এমন সব নির্দেশের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলো নবুওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত হবার সময় থেকে নিয়ে মিসর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। এর অন্তরভুক্ত রয়েছে ফেরাউনের দরবারে হযরত মূসা যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি এবং ফেরাউনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সময় যে সব নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছিল সেগুলোও। কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে এগুলোর উল্লেখ আছে। কিন্তু যতদূর মনে হয় তাওরাতে এগুলো অন্তরভূক্ত করা হয়নি। দশটি বিধানের মাধ্যমে তাওরাতের সূচনা হয়েছে। বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করার সময় সিনাই এলাকার তূর পাহাড়ে প্রস্তর ফলকে লিখিত আকারে তাঁকে এগুলো দেয়া হয়েছিল।

৪৯. অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব (আ) ও হযরত ইউসূফের (আ) মাধ্যমে যেসব আয়াত তাদের কাছে পৌঁছেছিল এবং পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের সৎকর্মশীলরা তাদের কাছে যেগুলো প্রচার করেছিলেন।

৫০. যেহেতু মানুষ কখনো নবী হতে পারে একথা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছিল, তাই তাদের এ মিথ্যাচার কেবলমাত্র হযরত নূহের বিরুদ্ধেই ছিল না বরং মূলত নবুওয়াতের পদকেই তারা অস্বীকার করেছিল।

৫১. অর্থাৎ আখেরাতের শাস্তি।

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَأَصْحَٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا
ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَٰلَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا۟ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِىٓ
أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا۟ يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ
نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى
بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

এভাবে আদ ও সামূদ এবং আসহাবুর রস্[৫২] ও মাঝখানের শতাব্দীগুলোর বহু লোককে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে আমি (পূর্বে ধ্বংস প্রাপ্তদের) দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর সেই জনপদের ওপর দিয়ে তো তারা যাতায়াত করেছে যার ওপর নিকৃষ্টতম বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল।[৫৩] তারা কি তার অবস্থা দেখে থাকেনি? কিন্তু তারা মৃত্যুর পরের জীবনের আশাই করে না।[৫৪]

তারা যখন তোমাকে দেখে, তোমাকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে। (বলে), "এ লোককে আল্লাহ রসূল করে পাঠিয়েছেন? এতো আমাদের পথভ্রষ্ট করে নিজেদের দেবতাদের থেকেই সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের প্রতি অটল বিশ্বাসী হয়ে থাকতাম।[৫৫] বেশ, সে সময় দূরে নয় যখন শাস্তি দেখে তারা নিজেরাই জানবে ভ্রষ্টতায় কে দূরে চলে গিয়েছিল।

৫২. আসহাবুর রস্ কারা ছিল, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের কোন বর্ণনাই সন্তোষজনক নয়। বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে, তারা এমন এক সম্প্রদায় ছিল যারা তাদের নবীকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে বা ঝুলিয়ে রেখে হত্যা করেছিল। আরবী ভাষায় "রাস্‌স" বলা হয় পুরাতন বা অন্ধ কূপকে।

৫৩. অর্থাৎ লূত জাতির জনপদ। নিকৃষ্টতম বৃষ্টি মানে পাথর বৃষ্টি। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় একথা বলা হয়েছে। হিজায বাসীদের বাণিজ্য কাফেলা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাবার পথে এ এলাকা অতিক্রম করতো। সেখানে তারা কেবল ধ্বংসাবশেষ দেখতো না বরং আশপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখে লূত জাতির শিক্ষণীয় ধ্বংস কাহিনীও শুনতো।

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰهُ ۚ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

কখনো কি তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো, যে তার নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে?[৫৬] তুমি কি এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিতে পারো? তুমি কি মনে করো তাদের অধিকাংশ লোক শোনে ও বোঝে? তারা পশুর মতো বরং তারও অধম।[৫৭]

৫৪. অর্থাৎ যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাই নিছক একজন দর্শক হিসেবে এ ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করেছে। এ থেকে কোন শিক্ষা নেয়নি। এ থেকে জানা যায়, পরকাল বিশ্বাসী ও পরকাল অবিশ্বাসীর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে কত বড় ফারাক। একজন নিছক ঘটনা বা কীর্তিকলাপ দেখে অথবা বড়জোর ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু অন্যজন ঐসব জিনিস থেকেই নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রকৃত সত্যের নাগাল পায়।

৫৫. কাফেরদের এ দু'টি কথা পরস্পর বিরোধী। প্রথম কথাটি থেকে জানা যায়, তারা নবীকে (সা) তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে এবং তাঁকে বিদ্রূপ করে তাঁর মর্যাদা হ্রাস করতে চাচ্ছে। তারা যেন বলতে চাচ্ছে, নবী (সা) তাঁর মর্যাদার চাইতে অনেক বেশী বড় দাবী করেছেন। দ্বিতীয় কথা জানা যায়, তারা তাঁর যুক্তির শক্তি ও ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা মেনে নিচ্ছে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে স্বীকার করে নিচ্ছে যে, তারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের আরাধ্য দেবতাদের বন্দনায় অবিচল না থাকলে এ ব্যক্তি তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিতেন। ইসলামী আন্দোলন তাদেরকে কি পরিমাণ আতংকিত করে তুলেছিল এই পরস্পর বিরোধী কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বেহায়ার মতো যখন তামাসা–বিদ্রূপ করতো তখন হীনমন্যতা বোধের পীড়নে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে এমন সব কথা বের হয়ে যেতো যা থেকে এ শক্তিটি তাদের মনে কি পরিমাণ আতংক সৃষ্টি করেছে তা স্পষ্ট বুঝা যেতো।

৫৬. প্রবৃত্তির কামনাকে খোদায় পরিণত করার মানে হচ্ছে, তার পূজা করা। আসলে এটাও ঠিক মূর্তি পূজা করা বা কোন সৃষ্টিকে উপাস্যে পরিণত করার মতই শিরক। হযরত আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ما تحت ظل السماء من اله يعبد من دون الله تعالى اعظم عند الله عزوجل من هوى يتبع –

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

৫ রুকূ'

তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার রব ছায়া বিস্তার করেন? তিনি চাইলে একে চিরন্তন ছায়ায় পরিণত করতেন। আমি সূর্যকে করেছি তার পথ-নির্দেশক।[৫৮] তারপর (যতই সূর্য উঠতে থাকে) আমি এ ছায়াকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে গুটিয়ে নিতে থাকি।[৫৯]

"এ আকাশের নিচে যতগুলো উপাস্যেরই উপাসনা করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপাস্য হচ্ছে এমন প্রবৃত্তির কামনা যার অনুসরণ করা হয়।" (তাবারানী) [আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল কাহাফ ৫০ টীকা।]

যে ব্যক্তি নিজের কামনাকে বুদ্ধির অধীনে রাখে এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে নিজের জন্য ন্যায় ও অন্যায়ের পথের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে যদি কোন ধরনের শিরকী বা কুফরী কর্মে লিপ্ত হয়েও পড়ে তাহলে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঠিক পথে আনা যেতে পারে এবং সে সঠিক পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তার ওপর অবিচল থাকবে এ আস্থাও পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তির দাস হচ্ছে একটি লাগামহীন উট। তার কামনা তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে সে পথহারা হয়ে সেদিকেই দৌড়াতে থাকবে। তার মনে ন্যায় ও অন্যায় এবং হক ও বাতিলের মধ্যে ফারাক করার এবং একটিকে ত্যাগ করে অন্যটিকে গ্রহণ করার কোন চিন্তা আদৌ সক্রিয় থাকে না। তাহলে কে তাকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে পারে? আর ধরে নেয়া যাক, যদি সে মেনেও নেয় তাহলে তাকে কোন নৈতিক বিধানের অধীন করে দেয়া কোন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়।

৫৭. অর্থাৎ গরু-ছাগলের দল যেমন জানে না তাদের যারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা তাদের চারণক্ষেত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, না কসাইখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তারা কেবল চোখ বন্ধ করে যারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ইশারায় চলতেই থাকে, ঠিক তেমনি এ জনসাধারণও তাদের নিজেদের শয়তানী প্রবৃত্তি ও পথ ভ্রষ্টকারী নেতাদের ইশারায় চোখ বন্ধ করে চলতেই থাকছে। তারা জানে না তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কল্যাণের দিকে, না ধ্বংসের দিকে। এ পর্যন্ত তাদের অবস্থা গরু-ছাগলের সাথে তুলনীয়। কিন্তু গরু-ছাগলকে আল্লাহ বুদ্ধিজ্ঞান ও চেতনা শক্তি দান করেননি। তারা যদি চারণক্ষেত্র ও কসাইখানার মধ্যে কোন পার্থক্য না করে থাকে তাহলে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তবে অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় একদল মানুষ যাদের আল্লাহ বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনা শক্তি দান করেছেন এবং তারপরও তারা গরু-ছাগলের মতো অসচেতনতা ও গাফলতির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

কেউ যেন প্রচার-প্রচারণাকে অর্থহীন গণ্য করা এ ভাষণের উদ্দেশ্য বলে মনে না করেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এ কথাগুলো এজন্য

বলা হচ্ছে না যে তিনি যেন লোকদেরকে অনর্থক বুঝাবার চেষ্টা ত্যাগ করেন। আসলে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যেই এ বক্তব্য রাখা হয়েছে, যদিও বাহ্যত সম্বোধন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে তাদের এ কথা শুনানো উদ্দেশ্য যে, ওহে গাফেলরা! তোমাদের এ অবস্থা কেন? আল্লাহ কি তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক এজন্য দিয়েছেন যে, তোমরা দুনিয়ায় পশুদের মতো জীবন যাপন করবে?

৫৮. মূলে "দলীল" (دليل) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক এমন একটি অর্থে যে অর্থে ইংরেজী ভাষায় Pilot শব্দটির ব্যবহার হয়। মাঝি-মাল্লাদের পরিভাষায় "দলীল" এমন এক ব্যক্তিকে বলা হয় যে নৌকাকে পথ-নির্দেশনা দিয়ে চালাতে থাকে। ছায়ার ওপর সূর্যকে দলীল করার অর্থ হচ্ছে এই যে, ছায়ার ছড়িয়ে পড়া ও সংকুচিত হওয়া সূর্যের উপরে ওঠা ও নেমে যাওয়া এবং তার উদয় হওয়া ও অস্তে যাওয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং তার আলামত।

ছায়া অর্থ আলোক ও অন্ধকারের মাঝামাঝি এমন অবস্থা যা সকাল বেলা সূর্য ওঠার আগে হয় এবং সারাদিন ঘরের মধ্যে, দেয়ালের পেছনে ও গাছের নিচে থাকে।

৫৯. নিজের দিকে গুটিয়ে নেয়া মানে হচ্ছে, অদৃশ্য ও বিলীন করে দেয়া। কারণ যে কোন জিনিস ধ্বংস হয় তা আল্লাহরই দিকে ফিরে যায়। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর দিক থেকেই আসে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

এ আয়াতের দু'টি দিক। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক দিক থেকে আয়াতটি মুশরিকদের বলছে, যাদি তোমরা পৃথিবীতে পশুর মতো জীবন ধারণ না করতে এবং কিছুটা বুদ্ধি-বিবেচনা ও সচেতনতার সাথে এগিয়ে চলতে, তাহলে প্রতিনিয়ত তোমরা এই যে ছায়া দেখতে পাচ্ছো এটিই তোমাদের এ শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, নবী তোমাদের যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তা যথার্থই সত্য ও সঠিক। তোমাদের সারা জীবন এ ছায়ার জোয়ার-ভাটার সাথে বিজড়িত। যদি চিরন্তন ছায়া হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণী এমন কি উদ্ভিদও জীবিত থাকতে পারে না। কারণ সূর্যের আলো ও উত্তাপের ওপর তাদের সবার জীবন নির্ভর করে। ছায়া যদি একেবারেই না থাকে তাহলেও জীবন অসাধ্য। কারণ সর্বক্ষণ সূর্যের মুখোমুখি থাকার এবং তার রশ্মি থেকে কোন আড়াল না পাওয়ার ফলে কোন প্রাণী এবং কোন উদ্ভিদও বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। বরং পানিও উধাও হয়ে যাবে। রোদ ও ছায়ার মধ্যে যদি হঠাৎ করে পরিবর্তন হতে থাকে তাহলে পৃথিবীর সৃষ্টিকূল পরিবেশের এসব আকস্মিক পরিবর্তন বেশীক্ষণ বরদাশ্ত করতে পারবে না। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন যার ফলে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ধীরে ধীরে ছায়া পড়ে ও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় এবং রোদ ক্রমান্বয়ে বের হয়ে আসে এবং বাড়তে ও কমতে থাকে। এ ধরনের বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা কোন অন্ধ প্রকৃতির হাতে আপনাআপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অথবা বহুসংখ্যক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভুও একে প্রতিষ্ঠিত করে এভাবে একটি ধারাবাহিক নিয়ম-শৃংখলা সহকারে চালিয়ে আসতে পারে না।

কিন্তু এসব বাহ্যিক শব্দের অভ্যন্তর থেকে আর একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে, বর্তমানে এই যে কুফরী ও শির্কের অজ্ঞতার ছায়া চতুরদিকে ছেয়ে আছে

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْیِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

আর তিনিই রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক,[৬০] ঘুমকে মৃত্যুর শান্তি এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে ওঠার সময়ে পরিণত করেছেন।[৬১]

আর তিনিই নিজের রহমতের আগেভাগে বাতাসকে সুসংবাদদাতারূপে পাঠান। তারপর আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বিশুদ্ধ পানি[৬২] একটি মৃত এলাকাকে তার মাধ্যমে জীবন দান করার এবং নিজের সৃষ্টির মধ্য থেকে বহুতর পশু ও মানুষকে তা পান করাবার জন্য।[৬৩] এ বিস্ময়কর কার্যকলাপ আমি বার বার তাদের সামনে আনি[৬৪] যাতে তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে কিন্তু অধিকাংশ লোক কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন মনোভাব পোষণ করতে অস্বীকার করে।[৬৫]

এটা কোন স্থায়ী জিনিস নয়। কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকারে হেদায়াতের সূর্য উদিত হয়েছে। বাহ্যত ছায়া বিস্তার লাভ করেছে দূর দূরান্তে। কিন্তু এ সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকবে ততই ছায়া সংকুচিত হতে থাকবে। তবে একটু সবরের প্রয়োজন। আল্লাহর আইন কখনো আকস্মিক পরিবর্তন আনে না। বস্তুজগতে যেমন সূর্য ধীরে ধীরে ওপরে ওঠে এবং ছায়া ধীরে ধীরে সংকুচিত হয় ঠিক তেমনি চিন্তা ও নৈতিকতার জগতেও হেদায়াতের সূর্যের উথান ও ভ্রষ্টতার ছায়ার পতন ধীরে ধীরেই হবে।

৬০. অর্থাৎ ঢাকবার ও লুকাবার জিনিস।

৬১. এ আয়াতের তিনটি দিক রয়েছে। একদিক থেকে এখানে তাওহীদের যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দিক থেকে নিত্যদিনকার মানবিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। তৃতীয় দিক থেকে সূক্ষ্মভাবে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, জাহেলীয়াতের রাত শেষ হয়ে গেছে, এখন জ্ঞান, চেতনা ও হেদায়াতের উজ্জ্বল দিবালোকের স্ফূরণ ঘটেছে এবং শিগগির বা দেরীতে যেমনি করেই হোক নিদ্রিতরা জেগে উঠবেই। তবে যাদের জন্য রাতের ঘুম ছিল মৃত্যু ঘুম তারা আর জাগবে না এবং তাদের না জেগে ওঠা হবে তাদের নিজেদের জন্যই জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া, দিনের কাজ কারবার তাদের কারণে বন্ধ হয়ে যাবে না।

৬২. অর্থাৎ এমন পানি যা সব ধরনের পংকিলতা থেকেও মুক্ত হয় আবার কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ ও জীবানুও তার মধ্যে থাকে না। যার সাহায্যে নাপাকি ধুয়ে সাফ করা যায় এবং মানুষ, পশু, পাখি, উদ্ভিদ সবাই জীবনী শক্তি লাভ করে।

৬৩. উপরের আয়াতটির মতো এ আয়াতটিরও তিনটি দিক রয়েছে। এর মধ্যে তাওহীদের যুক্তি রয়েছে, পরকালের যুক্তিও রয়েছে এবং এ সংগে এ সূক্ষ বিষয়বস্তুটিও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, জাহেলীয়াতের যুগ ছিল মূলত খরা ও দুর্ভিক্ষের যুগ। সে যুগে মানবিকতার ভূমি অনুর্বর ও অনাবাদী থেকে গিয়েছিল। এখন আল্লাহ অনুগ্রহ করে নবুওয়াতের রহমতের মেঘমালা পাঠিয়েছেন। তা থেকে অহী জ্ঞানের নির্ভেজাল জীবনবারি বর্ষিত হচ্ছে। সবাই না হলেও আল্লাহর বহু বান্দা তার স্বচ্ছ ধারায় অবগাহন করতে পারবেই।

৬৪. মূল শব্দগুলো হচ্ছে وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ –এর তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, বারিধারা বর্ষণের এ বিষয়বস্তুটি আমি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বারবার বর্ণনা করে প্রকৃত সত্য বুঝাবার চেষ্টা করেছি। দুই, আমি বারবার গ্রীষ্ম ও খরা, মওসূমী বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি এবং তা থেকে সৃষ্ট বিচিত্র জীবন–উপকরণসমূহ তাদের দেখাতে থেকেছি। তিন, আমি বৃষ্টিকে আবর্তিত করতে থাকি। অর্থাৎ সব সময় সব জায়গায় সমান বৃষ্টিপাত হয় না। বরং কখনো কোথাও চলে একদম খরা, কোথাও কম বৃষ্টিপাত হয়, কোথাও চাহিদা অনুযায়ী বৃষ্টিপাত হয়, কোথাও ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার আবির্ভাব হয় এবং এসব অবস্থায় বিভিন্ন বিচিত্র ফলাফল সামনে আসতে থাকে।

৬৫. যদি প্রথম দিক থেকে (অর্থাৎ তাওহীদের যুক্তির দৃষ্টিতে) দেখা যায়, তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়ঃ লোকেরা যদি চোখ মেলে তাকায় তাহলে নিছক বৃষ্টির ব্যবস্থাপনারই মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর একক রব্বুল আলামীন হবার প্রমাণ স্বরূপ এত বিপুল সখ্যক নিদর্শন দেখতে পাবে যে, একমাত্র সেটিই নবীর তাওহীদের শিক্ষা সত্য হবার পক্ষে তাদের নিশ্চিন্ত করতে পারে। কিন্তু আমি বারবার এ বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এবং দুনিয়ায় পানি বন্টনের এ কার্যকলাপ নিত্যনতুনভাবে একের পর এক তাদের সামনে আসতে থাকলেও এ জালেমরা কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। তারা সত্য ও ন্যায়নীতিকে মেনে নেয় না। তাদের আমি বুদ্ধি ও চিন্তার যে নিয়ামত দান করেছি তার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। এমন কি তারা নিজেরা যা কিছু বুঝতো না তা তাদের বুঝাবার জন্য কুরআনে বার বার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে–এ অনুগ্রহের জন্য শোকর গুজারীও করে না।

দ্বিতীয় দিক থেকে (অর্থাৎ আখেরাতের যুক্তির দৃষ্টিতে) দেখলে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ প্রতি বছর তাদের সামনে গ্রীষ্ম ও খরায় অসংখ্য সৃষ্টির মৃত্যুমুখে পতিত হবার এবং তারপর বর্ষার বদৌলতে মৃত উদ্ভিদ ও কীটপতংগের জীবিত হয়ে ওঠার নাটক অভিনীতি হতে থাকে। কিন্তু সবকিছু দেখেও এ নির্বোধের দল মৃত্যুপরের জীবনকে অসম্ভব বলে চলছে। বারবার সত্যের এ দ্ব্যর্থহীন নিদর্শনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় কিন্তু কুফরী ও অস্বীকৃতির অচলায়তন কোনক্রমেই টলে না। তাদের বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তির যে অতুলনীয় নিয়ামত দান করা হয়েছে তার অস্বীকৃতির ধারা কোনক্রমে খতমই হয় না। শিক্ষা ও উপদেশ দানের যে অনুগ্রহ তাদের প্রতি করা হয়েছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ মনোভাব তাদের চিরকাল অব্যাহত রয়েছে।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

যদি আমি চাইতাম তাহলে এক একটি জনবসতিতে এক একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী পাঠাতে পারতাম।[৬৬] *কাজেই হে নবী, কাফেরদের কথা কখনো মেনে নিয়ো না এবং এ কুরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জিহাদ করো।*[৬৭]

আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্ট এবং অন্যটি লোনা ও খার। আর দু'য়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের একাকার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে।[৬৮]

আর তিনিই পানি থেকে একটি মানুষ তৈরি করেছেন, আবার তার থেকে বংশীয় ও শ্বশুরালয়ের দু'টি আলাদা ধারা চালিয়েছেন।[৬৯] *তোমার রব বড়ই শক্তি সম্পন্ন।*

যদি তৃতীয় দিকটি (অর্থাৎ খরার সাথে জাহেলীয়াতের এবং রহমতের বারিধারার সাথে অহী ও নবুওয়াতের তুলনাকে) সামনে রেখে দেখা হয় তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ মানব জাতির ইতিহাসে এ দৃশ্য বার বার সামনে এসেছে যে, যখনই এ দুনিয়া নবী ও আল্লাহর কিতাবের কল্যাণসুধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তখনই মানবতা বন্ধ্যা হয়ে গেছে এবং চিন্তা ও নৈতিকতার ভূমিতে কাঁটাগুল্ম ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন হয়নি। আর যখনই অহী ও রিসালাতের জীবন বারি এ পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে তখনই মানবতার উদ্যান ফলেফুলে সুশোভিত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান মূর্খতা ও জাহেলীয়াতের স্থান দখল করেছে। জুলুম-নিপীড়ণের জায়গায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফাসেকী ও অশ্লীলতার জায়গায় নৈতিক ও চারিত্রিক মাহাত্মের ফুল ফুটেছে। যেদিকে তার দান যতটুকু পৌঁছেছে সেদিকেই অসদাচার কমে গেছে এবং সদাচার বেড়ে গেছে। নবীদের আগমন সবসময় একটি শুভ ও কল্যাণকর চিন্তা ও নৈতিক বিপ্লবের সূচনা করেছে। কখনো এর ফল খারাপ হয়নি। আর নবীদের বিধান ও নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে বা তা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানব জাতি সব সময় ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। কখনো এর ফল ভালো হয়নি। ইতিহাস এ দৃশ্য বারবার দেখিয়েছে এবং কুরআনও বার বার এদিকে ইশারা করেছে। কিন্তু এরপরও

লোকেরা শিক্ষা নেয় না। এটি একটি অমোঘ সত্য। হাজার বছরের মানবিক অভিজ্ঞতার ছাপ এর গায়ে লেগে আছে। কিন্তু একে অস্বীকার করা হচ্ছে। আর আজ নবী ও কিতাবের নিয়ামত দান করে আল্লাহ যে জনপদকে ধন্য করেছেন সে এর শোকর গুজারী করার পরিবর্তে উলটো অকৃতজ্ঞ মনোভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬৬. অর্থাৎ এমনটি করা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল না। চাইলে আমি বিভিন্ন স্থানে নবীর আবির্ভাব ঘটাতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। বরং সারা দুনিয়ার জন্য মাত্র একজন নবী পাঠিয়েছি। একটি সূর্য যেমন সারা দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট ঠিক তেমনি সঠিক পথ প্রদর্শনের এ একমাত্র সূর্যই সারা দুনিয়াবাসীর জন্য যথেষ্ট।

৬৭. বৃহত্তম জিহাদের তিনটি অর্থ। এক, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, অর্থাৎ চেষ্টা ও প্রাণপাত করার ব্যাপারে মানুষের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া। দুই, বড় আকারের প্রচেষ্টা। অর্থাৎ নিজের সমস্ত উপায়–উপকরণ তার মধ্যে নিয়োজিত করা। তিন, ব্যাপক প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কোন দিক এবং মোকাবিলার কোন ময়দান ছেড়ে না দেয়া। প্রতিপক্ষের শক্তি যেসব ময়দানে কাজ করছে সেসব ময়দানে নিজের শক্তি নিয়োজিত করা এবং সত্যের শির উঁচু করার জন্য যেসব দিক থেকে কাজ করার প্রয়োজন হয় সেসব দিক থেকে কাজ করা। কণ্ঠ ও কলমের জিহাদ, ধন ও প্রাণের জিহাদ এবং বন্দুক ও কামানের যুদ্ধ সবই এর অন্তরভুক্ত।

৬৮. যেখানে কোন বড় নদী এসে সাগরে পড়ে এমন প্রত্যেক জায়গায় এ অবস্থা হয়। এছাড়া সমূদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় মিঠা পানির স্রোত পাওয়া যায়। সমূদ্রের ভীষণ লবণাক্ত পানির মধ্যেও সে তার মিষ্টতা পুরোপুরি বজায় রাখে। তুর্কী নৌসেনাপতি সাইয়েদী আলী রইস তাঁর ষোড়শ শতকে লেখিত "মিরআতুল মামালিক" গ্রন্থে পারস্য উপসাগরে এমনিধারার একটি স্থান চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, সেখানে লবণাক্ত পানির নিচে রয়েছে মিঠা পানির স্রোত। আমি নিজে আমাদের নৌসেনাদের জন্য সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করেছি। বর্তমান যুগে আমেরিকান কোম্পানী যখন সউদী আরবে তেল উত্তোলনের কাজ শুরু করে তখন তারাও শুরুতে পারস্য উপসাগরের এসব স্রোত থেকে পানি সংগ্রহ করতে থাকে। পরে দাহরানের কাছে পানির কূয়া খনন করা হয় এবং তা থেকে পানি উঠানো হতে থাকে। বাহরাইনের কাছেও সমূদ্রের তলায় মিঠা পানির স্রোত রয়েছে। সেখান থেকে লোকেরা কিছুদিন আগেও মিঠা পানি সংগ্রহ করতে থেকেছে।

এ হচ্ছে আয়াতের বাহ্যিক বিষয়বস্তু। আল্লাহর শক্তিমত্তার একটি প্রকাশ থেকে এটি তাঁর একক ইলাহ ও একক রব হবার প্রমাণ পেশ করে। কিন্তু এর শব্দাবলীর অভ্যন্তর থেকে একটি সূক্ষ্ম ইশারা অন্য একটি বিষয়বস্তুর সন্ধান দেয়। সেটি হচ্ছে, মানব সমাজের সমুদ্র যতই লোনা ও খার হয়ে থাক না কেন আল্লাহ যখনই চান তার তলদেশ থেকে একটি সৎকর্মশীল দলের মিঠা স্রোত বের করে আনতে পারেন এবং সমুদ্রের লোনা পানির তরংগগুলো যতই শক্তি প্রয়োগ করুক না কেন তারা এই স্রোত গ্রাস করতে সক্ষম হবে না।

৬৯. অর্থাৎ নগণ্য এক ফোঁটা পানি থেকে মানুষের মতো এমনি ধরনের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি তৈরি করাটা তো সামান্য কৃতিত্বের ব্যাপার ছিল না কিন্তু তার উপর আরো

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে লোকেরা এমন সব সত্তার পূজা করছে যারা না তাদের উপকার করতে পারে, না অপকার। আবার অতিরিক্ত হচ্ছে এই যে, কাফের নিজের রবের মোকাবিলায় প্রত্যেক বিদ্রোহীর সাহায্যকারী হয়ে আছে।[৭০]

কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের একটি নয় বরং দু'টি আলাদা আলাদা নমুনা (নর ও নারী) তৈরি করেছেন। তারা মানবিক গুণাবলীর দিক দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত হলেও দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা অনেক বেশী। কিন্তু এ বিভিন্নতার কারণে তারা পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী নয় বরং পরস্পরের পুরোপুরি জোড়ায় পরিণত হয়েছে। তারপর এ জোড়াগুলো মিলিয়ে তিনি অদ্ভুত ভারসাম্য সহকারে (যার মধ্যে অন্যের কৌশল ও ব্যবস্থাপনার সামান্যতম দখলও নেই) দুনিয়ায় পুরুষও সৃষ্টি করছেন আবার নারীও। তাদের থেকে একদিকে পুত্র ও নাতিদের একটি ধারা চলছে। তারা অন্যের ঘর থেকে বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে আসছে। আবার অন্যদিকে কন্যা ও নাতনীদের একটি ধারা চলছে। তারা স্ত্রী হয়ে অন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে। এভাবে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবার মিশে সারা দেশ এক বংশ ও এক সভ্যতা–সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে।

এখানেও এ বিষয়বস্তুর দিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে যে, এ সমগ্র জীবন ক্ষেত্রে যে কর্মকৌশলটি সক্রিয় রয়েছে তার কর্মধারাই কিছুটা এমনি ধরনের যার ফলে এখানে বিভিন্নতা ও বিরোধ এবং তারপর বিভিন্ন বিরোধীয় পক্ষের জোড়া থেকেই যাবতীয় ফলাফলের উদ্ভব ঘটে। কাজেই তোমরা যে বিভিন্নতা ও বিরোধের মুখোমুখি হয়েছো তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। এটিও একটি ফলদায়ক জিনিস।

৭০. আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত ও তাঁর আইন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুনিয়ার যেখানে যা কিছু প্রচেষ্টা চলছে কাফেরের সমবেদনা তার প্রতি হবে না বরং তার সমবেদনা হবে এমন সব লোকদের প্রতি যারা সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। অনুরূপভাবে কাফেরের সমস্ত আগ্রহ আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ও তাঁর আনুগত্য করার সাথে সম্পৃক্ত হবে না বরং তাঁর হুকুম অমান্য করার সাথে সম্পৃক্ত হবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কাজ যে যেখানেই করবে কাফের যদি কার্যত তার সাথে শরীক না হতে পারে তাহলে অন্ততপক্ষে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েই দেবে। এভাবে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বুকে সাহস যোগাবে। অপরদিকে, যদি কেউ আল্লাহর হুকুম পালন করতে থাকে তাহলে কাফের তাকে বাধা দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না। নিজে বাধা দিতে না পারলে তাকে হিম্মতহারা করার জন্য যাকিছু সে করতে পারে তা করে ফেলবে। এমনকি যদি তার শুধুমাত্র নাক সিটকাবার ক্ষমতা বা সুযোগ থাকে তাহলে তাও করবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার প্রতিটি খবর তার জন্য হবে হৃদয়

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾

হে মুহাম্মাদ! তোমাকে তো আমি শুধুমাত্র একজন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।[৭১] এদের বলে দাও, "এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না, যে চায় সে তার নিজের রবের পথ অবলম্বন করুক, এটিই আমার প্রতিদান।"[৭১(ক)]

জুড়ানো সুখবর। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার প্রতিটি খবর যেন তার কলিজায় তীরের মতো বিঁধবে।

৭১. অর্থাৎ কোন ঈমানদারকে পুরস্কার এবং কোন অস্বীকারকারীকে শাস্তি দেয়া তোমার কাজ নয়। কাউকে জোর করে ঈমানের দিকে টেনে আনা এবং কাউকে জবরদস্তি অস্বীকার করা থেকে দূরে রাখার কাজেও তুমি নিযুক্ত হওনি। যে ব্যক্তি সত্য–সঠিক পথ গ্রহণ করবে তাকে শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেবে এবং যে ব্যক্তি নিজের কু পথে অবিচল থাকবে তাকে আল্লাহর পাকড়াও ও শাস্তির ভয় দেখাবে, তোমার দায়িত্ব এতটুকুই, এর বেশী নয়।

কুরআন মজীদের যেখানেই এ ধরনের উক্তি এসেছে সেখানেই তার বক্তব্যের মূল লক্ষ হচ্ছে কাফের সমাজ। সেখানে এ কথা বলাই তাদের উদ্দেশ্য যে, নবী হচ্ছেন একজন নিস্বার্থ সংস্কারক, যিনি আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণার্থে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন এবং তাদের শুভ ও অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। তিনি জোরপূর্বক তোমাদের এ পয়গাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন না। এভাবে বাধ্য করলে তোমরা অনর্থক বিক্ষুব্ধ হয়ে সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে। তোমরা যদি মেনে নাও তা হলে এতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে, তাঁর দু' পয়সা লাভ হবে না। আর যদি না মানো তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ, এখন আমার সাথে তোমাদের ব্যাপার জড়িত হয়ে পড়েছে।—একথা না বুঝার কারণে অনেক সময় লোকেরা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের ব্যাপারেও বুঝি নবীর কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়েই শেষ। অথচ কুরআন বিভিন্ন স্থানে বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, মুসলমানদের জন্য নবী কেবল সুসংবাদদাতাই নন বরং শিক্ষক, পরিশুদ্ধকারী এবং কর্মের আদর্শও। মুসলমানদের জন্য তিনি শাসক, বিচারক এবং এমন আমীরও যার আনুগত্য করতে হবে। তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসা প্রতিটি ফরমান তাদের জন্য আইনের মর্যাদা রাখে। সর্বান্তকরণে তাদের এ আইন মেনে চলতে হবে। কাজেই যারা وَمَا أَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ও مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ এবং এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্যান্য আয়াতকে নবী ও মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন তারা বিরাট ভুল করে যাচ্ছেন।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾

হে মুহাম্মাদ! ভরসা করো এমন আল্লাহর প্রতি যিনি জীবিত এবং কখনো মরবেন না। তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো। নিজের বান্দাদের গোনাহের ব্যাপারে কেবল তাঁরই জানা যথেষ্ট। তিনিই ছয়দিনে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব তৈরি করে রেখে দিয়েছেন, তারপর তিনিই (বিশ্ব-জাহানের সিংহাসন) আরশে সমাসীন হয়েছেন,[৭২] তিনিই রহমান, যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করো তাঁর অবস্থা সম্পর্কে।

তাদেরকে যখন বলা হয়, এই রহমানকে সিজদা করো তখন তারা বলে, "রহমান কি? তুমি যার কথা বলবে তাকেই কি আমরা সিজদা করতে থাকবো"?[৭৩] এ উপদেশটি উল্‌টো তাদের ঘৃণা আরো বাড়িয়ে দেয়।[৭৪]

৭১ (ক). ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনূন ৭০ টীকা।

৭২. মহান আল্লাহর আরশের ওপর সমাসীন হবার বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৪১-৪২, ইউনূস ৪ এবং হূদ ৭ টীকা।

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী ছ'দিনে তৈরি করার বিষয়টি মুতাশাবিহাতের অন্তরভুক্ত। এর অর্থ নির্ধারণ করা কঠিন। হতে পারে একদিন অর্থ একটি যুগ, আবার এও হতে পারে, দুনিয়ায় আমরা একদিন বলতে যে সময়টুকু বুঝি একদিন অর্থ সেই পরিমাণ সময়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা হা-মীম-আস্ সাজ্‌দাহ ১১-১৫ টীকা)।

৭৩. একথা তারা বলতো আসলে নিছক কাফের সুলভ ঔদ্ধত্য ও গোয়ার্তুমির বশে। যেমন ফেরাউন হযরত মূসাকে বলেছিল وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ? "রব্বুল আলামীন আবার কি?" অথচ মক্কার কাফেররা রহমান তথা দয়াময় আল্লাহ সম্পর্কে বেখবর ছিল না এবং ফেরাউনও রব্বুল আলামীন সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। কোন কোন মুফাস্‌সির এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, আরবদের মধ্যে আল্লাহর "রহমান" নামটি বেশী প্রচলিত ছিল না, তাই তারা এ আপত্তি করেছে। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ ভংগী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, না

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝٦١ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝٦٢ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝٦٣ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝٦٤

৬ রুকূ'

অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন[৭৫] এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ[৭৬] ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।[৭৭]

রহমানের (আসল) বান্দা তারাই[৭৮] যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে[৭৯] এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম।[৮০] তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়।[৮১]

জানার কারণে এ আপত্তি করা হয়নি বরং করা হয়েছিল জাহেলীয়াতের প্রাবল্যের কারণে। নয়তো এজন্য পাকড়াও করার পরিবর্তে আল্লাহ নরমভাবে তাদের বুঝিয়ে দিতেন যে, এটাও আমারই একটি নাম, এতে অবাক হবার কিছু নেই। তা ছাড়া একথা ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকে রহমান শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এটা বহুল প্রচলিত ও পরিচিত শব্দ ছিল। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আস সাজদাহ–৫ ও সাবা ৩৫ টীকা।

৭৪. এখানে তেলাওয়াতের সিজদা করার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। প্রত্যেক কুরআন পাঠক ও শ্রোতার এ জায়গায় সিজদা করা উচিত। তাছাড়া যখনই কেউ এ আয়াতটি শুনবে জবাবে বলবে, زَادَنَا اللّٰهُ خُضُوْعًا مَّا زَادَ لِلْاَعْدَاءِ نُفُوْرًا "আল্লাহ করুন, ইসলামের দুশমনদের ঘৃণা যত বাড়ে আমাদের আনুগত্য ও বিনয় যেন ততই বাড়ে।" এটি একটি সুন্নাত।

৭৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর ৮–১২ টীকা।

৭৬. অর্থাৎ সূর্য। যেমন সূরা নূহে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (আর সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন) [১৬ আয়াত]

৭৭. এ দু'টি ভিন্ন ধরনের মর্যাদা কিন্তু স্বভাবের দিক দিয়ে এরা পরস্পরের জন্য অপরিহার্য। দিন–রাত্রির আবর্তন ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করার ফলে মানুষ প্রথমে এ থেকে তাওহীদের শিক্ষা লাভ করে এবং আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গিয়ে থাকলে সংগে সংগেই সজাগ হয়ে যায়। এর দ্বিতীয় ফল হয়, আল্লাহর রবুবীয়াতের অনুভূতি জাগ্রত হয়ে মানুষ আল্লাহর সমীপে মাথা নত করে এবং কৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়।

৭৮. অর্থাৎ যে রহমানকে সিজদা করার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে এবং তোমরা তা অস্বীকার করছো, সবাই তো তাঁর জন্মগত বান্দা কিন্তু সচেতনতা সহকারে বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে যারা এসব বিশেষ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে তারাই তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা। তাছাড়া তোমাদের যে সিজদা করার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার ফলাফল তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বনকারীদের জীবনে দেখা যাচ্ছে এবং তা অস্বীকার করার ফলাফল তোমাদের নিজেদের জীবন থেকে পরিস্ফূট হচ্ছে। এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র নৈতিকতার দু'টি আদর্শের তুলনা করা। একটি আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল এবং দ্বিতীয় আদর্শটি জাহেলীয়াতের অনুসারী লোকদের মধ্যে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এ তুলনামূলক আলোচনার জন্য শুধুমাত্র প্রথম আদর্শ চরিত্রের সুস্পষ্ট বৈশিষ্টগুলো সামনে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় আদর্শকে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ও চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে সে নিজেই প্রতিপক্ষের ছবি দেখে নেয় এবং নিজেই উভয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে। তার চিত্র পৃথকভাবে পেশ করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ চারপাশের সকল সমাজে তার সোচ্চার উপস্থিতি ছিল।

৭৯. অর্থাৎ অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করে না। বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। নম্রভাবে চলার মানে দুর্বল ও রুগীর মতো চলা নয় এবং একজন প্রদর্শন অভিলাষী নিজের বিনয় প্রদর্শন করার বা নিজের আল্লাহ ভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের কৃত্রিম চলার ভংগী সৃষ্টি করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে চলার সময় এমন শক্তভাবে পা ফেলতেন যেন মনে হতো ওপর থেকে ঢালুর দিকে নেমে যাচ্ছেন। হযরত উমরের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ? সে বলে, না। তিনি ছড়ি উঠিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলেন, শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো। এ থেকে জানা যায়, নম্রভাবে চলা মানে, একজন ভালো মানুষের স্বাভাবিকভাবে চলা। কৃত্রিম বিনয়ের সাহায্যে যে চলার ভংগী সৃষ্টি করা হয় অথবা যে চলার মধ্য দিয়ে বানোয়াট দীনতা ও দুর্বলতার প্রকাশ ঘটানো হয় তাকে নম্রভাবে চলা বলে না।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মানুষের চলার মধ্যে এমন কি গুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসংগে সর্বপ্রথম এর কথা বলা হয়েছে? এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভংগীর নাম নয় বরং আসলে এটি হয় তার মন–মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির চলা,

একজন গুণ্ডা ও বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও জালেমের চলা, একজন আত্মম্ভরী অহংকারীর চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র-দীনহীনের চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেককে দেখে কোন্ ধরনের চলার পেছনে কোন্ ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কাজেই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, রহমানের বান্দাদের তোমরা সাধারণ লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেই তারা কোন্ ধরনের লোক পূর্ব পরিচিতি ছাড়াই আলাদাভাবে তা চিহ্নিত করতে পারবে। এ বন্দেগী তাদের মানসিকতা ও চরিত্র যেভাবে তৈরী করে দিয়েছে তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। এক ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই জানতে পারে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ৪৩, সূরা লোকমান ৩৩ টীকা)

৮০. মূর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া নাজানা লোক নয় বরং এমন লোক যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না। এভাবে প্রত্যেক বেহুদাপনার জবাবে তারাও সমানে বেহুদাপনা করে না। বরং যারাই তাদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে তারা অগ্রসর হয়ে যায়, যেমন কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ – (القصص : ٥٥)

"আর যখন তারা কোন বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। বলে, আরে ভাই, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।" (আল কাসাস ঃ ৫৫) [ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল কাসাস ৭২ ও ৭৮ টীকা]

৮১. অর্থাৎ ওটা ছিল তাদের দিনের জীবন এবং এটা হচ্ছে রাতের জীবন। তাদের রাত আরাম আয়েশে, নাচগানে, খেলা-তামাশায়, গপ-সপে এবং আড্ডাবাজী ও চুরি-চামারিতে অতিবাহিত হয় না। জাহেলীয়াতের এসব পরিচিত বদ কাজগুলোর পরিবর্তে তারা এ সমাজে এমন সব সৎকর্ম সম্পাদনকারী যাদের রাত কেটে যায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে দোয়া ও ইবাদাত করার মধ্য দিয়ে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের জীবনের এ দিকগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন সূরা সাজদায় বলা হয়েছে ঃ

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا –

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, নিজেদের রবকে ডাকতে থাকে আশায় ও আশংকায়।" (১৬ আয়াত)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

তারা দোয়া করতে থাকেঃ " হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আযাব তো সর্বনাশা। আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।[৮২] তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।[৮৩] তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।[৮৪]—এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দেয়া হবে[৮৫] এবং সেখানেই সে পড়ে থাকবে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়।

সূরা যারিয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

"এ সকল জান্নাতবাসী ছিল এমন সব লোক যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে মাগফিরাতের দোয়া করতো।" (১৭-১৮ আয়াত)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ -

"যে ব্যক্তি হয় আল্লাহর হুকুম পালনকারী, রাতের বেলা সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের প্রত্যাশা করে তার পরিণাম কি মুশরিকের মতো হতে পারে?" (৯ আয়াত)

৮২. অর্থাৎ এ ইবাদাত তাদের মধ্যে কোন অহংকারের জন্ম দেয় না। আমরা তো আল্লাহর প্রিয়, কাজেই আগুন আমাদের কেমন করে স্পর্শ করতে পারে, এ ধরনের আত্মগর্বও তাদের মনে সৃষ্টি হয় না। বরং নিজেদের সমস্ত সৎকাজ ও ইবাদাত-বন্দেগী সত্ত্বেও তারা এ ভয়ে কাঁপতে থাকে যে, তাদের কাজের ভুল-ত্রুটিগুলো বুঝি তাদের আযাবের সম্মুখীন করলো। নিজেদের তাকওয়ার জোরে জান্নাত জয় করে নেবার অহংকার তারা করে না। বরং নিজেদের মানবিক দুর্বলতাগুলো মনে করে এবং এজন্যও নিজেদের কার্যাবলীর ওপর নয় বরং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ওপর থাকে তাদের ভরসা।

৮৩. অর্থাৎ তাদের অবস্থা এমন নয় যে, আরাম-আয়েশ, বিলাসব্যসন, মদ-জুয়া, ইয়ার-বন্ধু, মেলা-পার্বন ও বিয়েশাদীর পেছনে অঢেল পয়সা খরচ করছে এবং নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী করে নিজেকে দেখাবার জন্য খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-গাড়ি, সাজগোজ ইত্যাদির পেছনে নিজের টাকা-পয়সা ছড়িয়ে চলছে। আবার তারা একজন অর্থলোভীর মতো নয় যে, এক একটা পয়সা গুণে গুণে রাখে। এমন অবস্থাও তাদের নয় যে, নিজেও খায় না, নিজের সামর্থ অনুযায়ী নিজের ছেলেমেয়ে ও পরিবারের লোকজনদের প্রয়োজনও পূর্ণ করে না এবং প্রাণ খুলে কোন ভালো কাজে কিছু ব্যয়ও করে না। আরবে এ দু'ধরনের লোক বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যেতো। একদিকে ছিল একদল লোক যারা প্রাণ খুলে খরচ করতো। কিন্তু প্রত্যেকটি খরচের উদ্দেশ্য হতো ব্যক্তিগত বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের দানশীলতা ও ধনাঢ্যতার ডংকা বাজানো। অন্যদিকে ছিল সর্বজন পরিচিত কৃপণের দল। ভারসাম্যপূর্ণ নীতি খুব কম লোকের মধ্যে পাওয়া যেতো। আর এই কম লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ।

এ প্রসংগে অমিতব্যয়িতা ও কার্পণ্য কি জিনিস তা জানা উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিসকে অমিতব্যয়িতা বলা হয়। এক, অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করা, তা একটি পয়সা হলেও। দুই, বৈধ কাজে ব্যয় করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে সে নিজের সামর্থের চাইতে বেশী ব্যয় করে অথবা নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী যে অর্থসম্পদ সে লাভ করেছে তা নিজেরই বিলাসব্যসনে ও বাহ্যিক আড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে পারে। তিন, সৎকাজে ব্যয় করা। কিন্তু আল্লাহর জন্য নয় বরং অন্য মানুষকে দেখাবার জন্য। পক্ষান্তরে কার্পণ্য বলে বিবেচিত হয় দু'টি জিনিস। এক, মানুষ নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সামর্থ ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয় করে না। দুই, ভালো ও সৎকাজে তার পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। এ দু'টি প্রান্তিকতার মাঝে ইসলামই হচ্ছে ভারসাম্যের পথ। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

من فقه الرجل قصده فى معيشته

"নিজের অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা মানুষের ফকীহ (জ্ঞানবান) হবার অন্যতম আলামত।" (আহমদ ও তাবারানী, বর্ণনাকারী আবুদ্ দারদা)

৮৪. অর্থাৎ আরববাসীরা যে তিনটি বড় গোনাহের সাথে বেশী করে জড়িত থাকে সেগুলো থেকে তারা দূরে থাকে। একটি হলো শির্‌ক, দ্বিতীয়টি অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তৃতীয়টি যিনা। এ বিষয়বস্তুটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপুল সংখ্যক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে বড় গোনাহ কি? তিনি বললেন ঃ ان تجعل لله ندا وهو خلقك "তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাও। অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? বললেন ঃ ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك "তুমি যদি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে সে তোমার সাথে আহারে অংশ নেবে।" জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? বললেন ঃ ان تزنى حليلة جارك "তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ) যদিও আরো অনেক কবীরা গোনাহ আছে কিন্তু সেকালের আরব সমাজে এ তিনটি গোনাহই সবচেয়ে বেশী জেঁকে বসেছিল। তাই এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের এ বৈশিষ্ট সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল যে, সমগ্র আরব সমাজে মাত্র এ গুটিকয় লোকই এ পাপগুলো থেকে মুক্ত আছে।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, মুশরিকদের দৃষ্টিতে তো শির্‌ক থেকে দূরে থাকা ছিল একটি মস্ত বড় দোষ, এক্ষেত্রে একে মুসলমানদের একটি প্রধান গুণ হিসেবে তাদের সামনে তুলে ধরার যৌক্তিকতা কি ছিল? এর জবাব হচ্ছে আরববাসীরা যদিও শিরকে লিপ্ত ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট মনোভাবের অধিকারী ছিল কিন্তু আসলে এর শিকড় উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল, গভীর তলদেশে পৌঁছেনি। দুনিয়ার কোথাও কখনো শিরকের শিকড় মানব প্রকৃতির গভীরে প্রবিষ্ট থাকে না। বরঞ্চ নির্ভেজাল আল্লাহ বিশ্বাসের মহত্ব তাদের মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিল। তাকে উদ্দীপিত করার জন্য শুধুমাত্র উপরিভাগে একটুখানি আঁচড় কাটার প্রয়োজন ছিল। জাহেলিয়াতের ইতিহাসের বহুতর ঘটনাবলী এ দু'টি কথার সাক্ষ দিয়ে থাকে। যেমন আবরাহার হামলার সময় কুরাইশদের প্রত্যেকটি শিশুও জানতো যে, কাবাগৃহে রক্ষিত মূর্তিগুলো এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না বরং একমাত্র এ গৃহের মালিক আল্লাহই এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। হাতি সেনাদের ধ্বংসের পর সমকালীন কবিরা যে সব কবিতা ও কাসীদা পাঠ করেছিলেন এখনো সেগুলো সংরক্ষিত আছে। সেগুলোর প্রতিটি শব্দ সাক্ষ দিচ্ছে, তারা এ ঘটনাকে নিছক মহান আল্লাহর শক্তির প্রকাশ মনে করতো এবং এতে তাদের উপাস্যদের কোন কৃতিত্ব আছে বলে ভুলেও মনে করতো না। এ সময় কুরাইশ ও আরবের সমগ্র মুশরিক সমাজের সামনে শিরকের নিকৃষ্টতম পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হয়েছিল। আবরাহা মক্কা যাওয়ার পথে তায়েফের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তায়েফবাসীরা আবরাহা কর্তৃক তাদের "লাত" দেবতার মন্দির বিধ্বস্ত হওয়ার আশংকায় তাকে কাবা ধ্বংসের কাজে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিল এবং পার্বত্য পথে তার সৈন্যদের নিরাপদে মক্কায় পৌঁছিয়ে দেবার জন্য পথ প্রদর্শকও দিয়েছিল। এ ঘটনার তিক্ত স্মৃতি কুরাইশদেরকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানসিকভাবে পীড়ন করতে থাকে এবং বছরের পর বছর তারা তায়েফের পথ প্রদর্শকের কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। তাছাড়া কুরাইশ ও অন্যান্য আরববাসীরা নিজেদের দীনকে হযরত ইবরাহীমের আনীত দীন মনে করতো। নিজেদের বহু ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি এবং বিশেষ করে হজ্জের নিয়মকানুন ও রসম

রেওয়াজকে ইবরাহীমের দীনের অংশ গণ্য করতো। তারা একথাও মানতো যে, হযরত ইবরাহীম একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং তিনি কখনো মূর্তি পূজা করেননি। তাদের মধ্যে যেসব কথা ও কাহিনী প্রচলিত ছিল তাতে মূর্তি পূজার প্রচলন তাদের দেশে কবে থেকে শুরু হয়েছিল এবং কোন্ মূর্তিটি কে কবে কোথায় থেকে এনেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষিত ছিল। একজন সাধারণ আরবের মনে নিজের উপাস্য দেবতাদের প্রতি যে ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল তা এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, কখনো তার প্রার্থনা ও আশা-আকাংখা বিরোধী কোন ঘটনা ঘটে গেলে অনেক সময় নিজের উপাস্য দেবতাদেরকেই সে তিরস্কার করতো, তাদেরকে অপমান করতো এবং তাদের সামনে নযরানা পেশ করতো না। একজন আরব নিজের পিতার হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল। 'যুল খালাসাহ' নামক ঠাকুরের আস্তানায় গিয়ে সে ধর্না দেয় এবং এ ব্যাপারে তার ভবিষ্যত কর্মপন্থা জানতে চায়। সেখান থেকে এ ধরনের কাজ না করার জবাব আসে। এতে আরবটি ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে থাকে ঃ

لو كنت يا ذا الخلص الموتورا   مثلى وكان شيخك المقبورا

لم تنه عن قتل العداة زورا

অর্থাৎ " হে যুল খালাসা! তুমি যদি হতে আমার জায়গায়
নিহত হতো যদি তোমার পিতা
তাহলে কখনো তুমি মিথ্যাচারী হতে না
বলতে না প্রতিশোধ নিয়ো না জালেমদের থেকে।"

অন্য একজন আরব তার উটের পাল নিয়ে যায় সা'দ নামক দেবতার আস্তানায় তাদের জন্য বরকত লাভ করার উদ্দেশ্যে। এটি ছিল একটি লম্বা ও দীর্ঘ মূর্তি। বলির পশুর চাপ চাপ রক্ত তার গায়ে লেপ্টেছিল। উটেরা তা দেখে লাফিয়ে ওঠে এবং চারদিকে ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে। আরবটি তার উটগুলোকে এভাবে চারদিকে বিশৃংখলভাবে ছুটে যেতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে মূর্তিটির গায়ে পাথর মারতে মারতে বলতে থাকে ঃ "আল্লাহ তোর সর্বনাশ করুক। আমি এসেছিলাম বরকত নেবার জন্য কিন্তু তুই তো আমার এই বাকি উটগুলোকেও ভাগিয়ে দিয়েছিস।" অনেক মূর্তি ছিল যেগুলো সম্পর্কে বহু ন্যাক্কারজনক গল্প প্রচলিত ছিল। যেমন ছিল আসাফ ও নায়েলার ব্যাপারে। এ দু'টি মূর্তি রক্ষিত ছিল সাফা ও মারওয়ার ওপর। এদের সম্পর্কে প্রচলিত ছিল যে, এরা দু'জন ছিল মূলত একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। এরা কাবাঘরের মধ্যে যিনা করে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাথরে পরিণত করে দেন। যেসব দেবতার এ হচ্ছে আসল রূপ, তাদের পূজারী ও ভক্তদের মনে তাদের কোন যথার্থ মর্যাদা থাকতে পারে না। এসব দিক সামনে রাখলে এ কথা সহজে অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্যের একটি সুগভীর মূল্যবোধ তাদের অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজিত ছিল। কিন্তু একদিকে অন্ধ রক্ষণশীলতা তাকে দমিয়ে রেখেছিল এবং অন্যদিকে কুরাইশ পুরোহিতরা এর বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ উদ্দীপিত করে তুলছিল। কারণ তারা আশংকা করছিল দেবতাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা খতম হয়ে গেলে আরবে তাদের যে কেন্দ্রীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তা

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

তবে তারা ছাড়া যারা (ঐসব গোনাহের পর) তাওবা করেছে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে।[৮৬] এ ধরনের লোকদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন[৮৭] এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

খতম হয়ে যাবে এবং তাদের অর্থোপার্জনও বাধাগ্রস্ত হবে। এসব উপাদানের ভিত্তিতে যে মুশরিকী ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল তা তাওহীদের দাওয়াতের মোকাবিলায় কোন গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে দাঁড়াতে পারতো না। তাই কুরআন নিজেই মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছে ঃ তোমাদের সমাজে যেসব কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, তারা শির্কমুক্ত এবং নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এদিক থেকে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বকে মুশরিকরা মুখে মেনে নিতে না চাইলেও মনে মনে তারা এর ভারীত্ব অনুভব করতো।

৮৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ শাস্তির ধারা খতম হবে না বরং একের পর এক জারী থাকবে। দুই, যে ব্যক্তি কুফরী, শিরক বা নাস্তিক্যবাদের সাথে হত্যা ও অন্যান্য গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে যাবে সে বিদ্রোহের শাস্তি আলাদাভাবে ভোগ করবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে আলাদা আলাদাভাবে। তার ছোট বড় প্রত্যেকটি অপরাধ শুমার করা হবে। কোন একটি ভুলও ক্ষমা করা হবে না। হত্যার জন্য একটি শাস্তি দেয়া হবে না বরং হত্যার প্রত্যেকটি কর্মের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দেয়া হবে। যিনার শাস্তিও একবার হবে না বরং যতবারই সে এ অপরাধটি করবে প্রত্যেকবারের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি পাবে। তার অন্যান্য অপরাধ ও গোনাহের শাস্তিও এ রকমই হবে।

৮৬. যারা ইতিপূর্বে নানা ধরনের অপরাধ করেছে এবং এখন সংশোধন প্রয়াসী হয়েছে তাদের জন্য এটি একটি সুসংবাদ। এটি ছিল সাধারণ ক্ষমার (General Amnesty) একটি ঘোষণা। এ ঘোষণাটিই সেকালের বিকৃত সমাজের লাখো লাখো লোককে স্থায়ী বিকৃতি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। এটিই তাদেরকে আশার আলো দেখায় এবং অবস্থা সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যথায় যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমরা যে পাপ করেছো তার শাস্তি থেকে এখন কোন প্রকারেই নিষ্কৃতি পেতে পারো না, তাহলে এটি তাদেরকে হতাশ করে চিরকালের জন্য পাপ সাগরে ডুবিয়ে দিতো এবং তাদের সংশোধনের আর কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। অপরাধীকে একমাত্র ক্ষমার আশাই অপরাধের শৃংখল থেকে মুক্ত করতে পারে। নিরাশ হবার পর সে ইবলীসে পরিণত হয়। তাওবার এ নিয়ামতটি আরবের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে কিভাবে সঠিক পথে এনেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে তা অনুমান করা

যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবনে জারীর ও তাবারানী এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে নববী থেকে এশার নামায পড়ে ফিরছি এমন সময় দেখি এক ভদ্রমহিলা আমার দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার কামরায় চলে গেলাম এবং দরজা বন্ধ করে নফল নামায পড়তে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর সে দরজার কড়া নাড়লো। আমি উঠে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি চাও? সে বলতে লাগলো, আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করতে এসেছি। আমি যিনা করেছি। আমার পেটে অবৈধ সন্তান ছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে আমি তাকে মেরে ফেলেছি। এখন আমি জানতে চাই আমার গোনাহ মাফ হবার কোন পথ আছে কি না? আমি বললাম, না কোনক্রমেই মাফ হবে না। সে বড়ই আক্ষেপ সহকারে হা–হুতাশ করতে করতে চলে গেলো। সে বলতে থাকলো ঃ "হায়! এ সৌন্দর্য আগুনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল।" সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায শেষ করার পর আমি তাঁকে রাতের ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন ঃ আবু হুরাইরা, তুমি বড়ই ভুল জবাব দিয়েছো। তুমি কি কুরআনে এ আয়াত পড়নি–

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ .... اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا (الفرقان : ٦٨–٧٠)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ জবাব শুনে আমি সংগে সংগেই বের হয়ে পড়লাম। মহিলাটিকে খুঁজতে লাগলাম। রাতে এশার সময়ই তাকে পেলাম। আমি তাকে সুখবর দিলাম। তাকে বললাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার প্রশ্নের এ জওয়াব দিয়েছেন। শোনার সাথেসাথেই সে সিজদানত হলো এবং বলতে থাকলো, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমার জন্য ক্ষমার দরজা খুলে দিয়েছেন। তারপর সে গোনাহ থেকে তাওবা করলো এবং নিজের বাঁদীকে তার পুত্রসহ মুক্ত করে দিল। হাদীসে প্রায় একই ধরনের অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেটি একটি বৃদ্ধের ঘটনা। তিনি এসে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে আরজ করছিলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! সারা জীবন গোনাহের মধ্যে কেটে গেলো। এমন কোনো গোনাহ নেই যা করিনি। নিজের গোনাহ যদি দুনিয়ার সমস্ত লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেই তাহলে সবাইকে গোনাহের সাগরে ডুবিয়ে দেবে। এখনো কি আমার ক্ষমার কোন পথ আছে? জবাব দিলেন ঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছো? বৃদ্ধ বললেন ঃ আমি সাক্ষ দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যাও, আল্লাহ গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমার গোনাহগুলোকে নেকীতে পরিণত করে দেবেন। বৃদ্ধ বললেন ঃ আমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ কি ক্ষমা করবেন? জবাব দিলেন ঃ হাঁ, তোমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (ইবনে কাসীর, ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে)

৮৭. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, যখন তারা তাওবা করবে তখন ইতিপূর্বে কুফরী জীবনে তারা যে সমস্ত খারাপ কাজ করতো তার জায়গায় এখন ঈমান আনুগত্যের জীবনে মহান আল্লাহ তাদের সৎকাজ করার সুযোগ দেবেন এবং তারা সৎকাজ করতে থাকবে। ফলে সৎকাজ তাদের অসৎ কাজের জায়গা দখল করে নেবে। দুই, তাওবার ফলে কেবল তাদের আমলনামা থেকে তারা কুফরী ও গোনাহগারির জীবনে যেসব অপরাধ করেছিল সেগুলো

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝٧١ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝٧٢ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝٧٣

যে ব্যক্তি তাওবা করে সৎকাজের পথ অবলম্বন করে, সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মতই ফিরে আসে।[৮৮] —(আর রহমানের বান্দা হচ্ছে তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না[৮৯] এবং কোন বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়।[৯০] তাদের যদি তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয় তাহলে তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকে না।[৯১]

কেটে দেয়া হবে না বরং তার পরিবর্তে প্রত্যেকের আমলনামায় এ নেকী লেখা হবে যে, এ হচ্ছে সেই বান্দা যে বিদ্রোহ ও নাফরমানির পথ পরিহার করে আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করেছে। তারপর যতবারই সে নিজের পূর্ববর্তী জীবনের খারাপ কাজগুলো স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে থাকবে এবং নিজের প্রভূ রব্বুল আলামীনের কাছে তাওবা করে থাকবে ততটাই নেকী তার ভাগে লিখে দেয়া হবে। কারণ ভুলের জন্য লজ্জিত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়াই একটি নেকীর কাজ। এভাবে তার আমলনামায় পূর্বেকার সমস্ত পাপের জায়গা দখল করে নেবে পরবর্তীকালের নেকীসমূহ এবং কেবলমাত্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার মধ্যেই তার পরিণাম সীমিত থাকবে না বরং উল্‌টো তাকে পুরস্কৃতও করা হবে।

৮৮. অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তাঁর দরবারই বান্দার আসল ফিরে আসার জায়গা এবং নৈতিক দিক দিয়েও তাঁর দরবারই এমন একটি জায়গা যেদিকে তার ফিরে আসা উচিত। আবার ফলাফলের দিক দিয়েও তাঁর দরবারের দিকে ফিরে আসা লাভজনক। নয়তো দ্বিতীয় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এসে মানুষ শাস্তি থেকে বাঁচতে অথবা পুরস্কার পেতে পারে। এছাড়া এর অর্থ এও হয় যে, সে এমন একটি দরবারের দিকে ফিরে যায় যেখানে সত্যি ফিরে যাওয়া যেতে পারে, যেটি সর্বোত্তম দরবার, সমস্ত কল্যাণ যেখান থেকে উৎসারিত হয়, যেখান থেকে লজ্জিত অপরাধীকে খেদিয়ে দেওয়া হয় না বরং ক্ষমা ও পুরস্কৃত করা হয়, যেখানে ক্ষমা প্রার্থনাকারীর অপরাধ গণনা করা হয় না বরং দেখা হয় সে তাওবা করে নিজের কতটুকু সংশোধন করে নিয়েছে এবং যেখানে বান্দা এমন প্রভুর সাক্ষাত পায় যিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠেপড়ে লাগেন না বরং নিজের লজ্জাবনত গোলামের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন।

৮৯. এরও দু'টি অর্থ হয়। এক, তারা কোন মিথ্যা সাক্ষ দেয় না এবং এমন কোন জিনিসকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য হিসেবে গণ্য করে না যাকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য বলে তারা জানে না। অথবা তারা যাকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্যের বিরোধী ও বিপরীত বলে নিশ্চিতভাবে

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ
اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا
وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا
وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

তারা প্রার্থনা করে থাকে, " হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও[৯২] এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম।[৯৩]—এরাই নিজেদের সবরের[৯৪] ফল উন্নত মনজিলের আকারে পাবে।[৯৫] অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস!

হে মুহাম্মাদ! লোকদের বলো, "আমার রবের তোমাদের কি প্রয়োজন, যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো।[৯৬] এখন যে তোমরা মিথ্যা আরোপ করেছো, শিগ্‌গীর এমন শাস্তি পাবে যে, তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হবে না।"

জানে। দুই, তারা মিথ্যা প্রত্যক্ষ করে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার দেখে না এবং তা দেখার সংকল্প করে না। এ দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে মিথ্যা শব্দটি বাতিল ও অকল্যাণের সমার্থক। খারাপ কাজের গায়ে শয়তান যে বাহ্যিক স্বাদ চাকচিক্য ও লাভের প্রলেপ লাগিয়ে রেখেছে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই মানুষ সেদিকে যায়। এ প্রলেপ অপসৃত হলে প্রত্যেকটি অসৎ কাজ মিথ্যা ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ দেখা যায়। এ ধরনের মিথ্যার জন্য মানুষ কখনো প্রাণপাত করতে পারে না। কাজেই প্রত্যেকটি বাতিল, গোনাহ ও খারাপ কাজ এদিক দিয়ে মিথ্যা যে, তা মিথ্যা চাকচিক্যের কারণে মানুষকে নিজের দিকে টেনে নেয়। মু'মিন যেহেতু সত্যের পরিচয় লাভ করে তাই এ মিথ্যা যতই হৃদয়গ্রাহী যুক্তি অথবা দৃষ্টিনন্দন শিল্পকারিতা কিংবা শ্রুতিমধুর সুকণ্ঠের পোশাক পরিহিত হয়ে আসুক না কেন এসব যে তার নকল রূপ, তা সে চিনে ফেলে।

৯০. এখানে মূলে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরে যে মিথ্যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে لغو শব্দটি তার ওপরও প্রযুক্ত হয় এবং এই সংগে সমস্ত অর্থহীন, আজেবাজে ফালতু কথাবার্তা ও কাজও এর অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা জেনে শুনে এ ধরনের কথা ও কাজ দেখতে বা শুনতে অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করতে যায় না। আর যদি কখনো তাদের পথে এমন কোন জিনিস এসে যায়, তাহলে

তার প্রতি একটা উড়ো নজর না দিয়েও তারা এভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে যেমন একজন অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ময়লার স্তূপ অতিক্রম করে চলে যায়। ময়লা ও পচা দুর্গন্ধের ব্যাপারে একজন কুরুচিসম্পন্ন ও নোংরা ব্যক্তিই আগ্রহ পোষণ করতে পারে কিন্তু একজন সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির শিকার হওয়া ছাড়া কখনো তার ধারে কাছে যাওয়াও বরদাশত করতে পারে না। দুর্গন্ধের স্তূপের কাছে বসে আনন্দ পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন ৪ টীকা।)

৯১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا এর শাব্দিক তরজমা হচ্ছে, "তারা তার ওপর অন্ধ ও বোবা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। কিন্তু এখানে "ঝাঁপিয়ে পড়া" আভিধানিক অর্থে নয় বরং পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আমরা কথায় বলি, "জিহাদের হুকুম শুনে বসে রইলো।" এখানে বসে থাকা শব্দটি আভিধানিক অর্থে নয় বরং জিহাদের জন্য না ওঠা ও নড়চড়া না করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তারা এমন লোক নয় যারা আল্লাহর আয়াত শুনে একটুও নড়ে না বরং তারা তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা সেগুলো মেনে চলে। যেটি ফরয করা হয়েছে তা অবশ্য পালন করে। যে কাজের নিন্দা করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকে। যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তার কল্পনা করতেই তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে।

৯২. অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের তাওফীক দান করো এবং পবিত্র–পরিচ্ছন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী করো কারণ একজন মু'মিন তার স্ত্রী ও সন্তানদের দৈহিক সৌন্দর্য ও আয়েশ–আরাম থেকে নয় বরং সদাচার ও সচ্চরিত্রতা থেকেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। দুনিয়ায় যারা তার সবচেয়ে প্রিয় তাদেরকে দোজখের ইন্ধনে পরিণত হতে দেখার চাইতে বেশী কষ্টকর জিনিস তার কাছে আর কিছুই নেই। এ অবস্থায় স্ত্রীর সৌন্দর্য ও সন্তানদের যৌবন ও প্রতিভা তার জন্য আরো বেশী মর্মজ্বালার কারণ হবে। কারণ সে সব সময় এ মর্মে দুঃখ করতে থাকবে যে, এরা সবাই নিজেদের এসব যোগ্যতা ও গুণাবলী সত্ত্বেও আল্লাহর আযাবের শিকার হবে।

এখানে বিশেষ করে এ বিষয়টি দৃষ্টিসমক্ষে রাখা উচিত যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন মক্কার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যার প্রিয়তম আত্মীয় কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে অবস্থান করছিল না। কোন স্বামী ঈমান এনে থাকলে তার স্ত্রী তখনো কাফের ছিল। কোন স্ত্রী ঈমান এনে থাকলে তার স্বামী তখনো কাফের ছিল। কোন যুবক ঈমান এনে থাকলে তার মা–বাপ, ভাই, বোন সবাই তখনো কাফের ছিল। আর কোন বাপ ঈমান এনে থাকলে তখনো তার যুবক পুত্ররা কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি মুসলমান একটি কঠিন আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করছিল এবং তার অন্তর থেকে যে দোয়া বের হচ্ছিল তার সর্বোত্তম প্রকাশ এ আয়াতে করা হয়েছে। "চোখের শীতলতা" শব্দ দু'টি এমন একটি অবস্থার চিত্র অংকন করেছে যা থেকে বুঝা যায়, নিজের প্রিয়জনদেরকে কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে এক ব্যক্তি

এতই কষ্ট অনুভব করছে যেন তার চোখ ব্যথায় টনটন করছে এবং সেখানে খচখচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে। দীনের প্রতি তারা যে ঈমান এনেছে তা যে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারেই এনেছে—একথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অবস্থা এমন লোকদের মতো নয় যাদের পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও উপদলে যোগ দেয় এবং সব ব্যাংকে আমাদের কিছু না কিছু পুঁজি আছে এই ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত থাকে।

৯৩. অর্থাৎ তাকওয়া-আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা সবার চেয়ে এগিয়ে যাবো। কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে সবার অগ্রগামী হবো। নিছক সৎকর্মশীলই হবো না বরং সৎকর্মশীলদের নেতা হবো এবং আমাদের বদৌলতে সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতা প্রসারিত হবে। একথার মর্মার্থ এই যে, এরা এমন লোক যারা ধন-দৌলত ও গৌরব-মাহাত্মের ক্ষেত্রে নয় বরং আল্লাহভীতি ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে পরস্পরের অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের যুগে কিছু লোক এ আয়াতটিকেও নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রার্থী হওয়া ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের জন্য অগ্রবর্তী হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, " হে আল্লাহ! মুত্তাকীদেরকে আমাদের প্রজা এবং আমাদেরকে তাদের শাসকে পরিণত করো।" বস্তুত, ক্ষমতা ও পদের প্রার্থীরা ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রশংসনীয় হতে পারে না।

৯৪. সবর শব্দটি এখানে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সত্যের শত্রুদের জুলুম-নির্যাতনের মোকাবিলা সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সাথে করা। সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও তার মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সব ধরনের বিপদ-আপদ ও কষ্ট বরদাশত করা। সব রকমের ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবিলায় সঠিক পথে দৃঢ়পদ থাকা। শয়তানের সমস্ত প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা সত্ত্বেও কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা। গোনাহের যাবতীয় স্বাদ ও লাভ প্রত্যাখ্যান করা এবং সৎকাজ ও সঠিক পথে অবস্থানের প্রত্যেকটি ক্ষতি ও তার বদৌলতে অর্জিত প্রতিটি বঞ্চনা মেনে নেওয়া। মোটকথা এ একটি শব্দের মধ্যে দীন এবং দীনী মনোভাব, কর্মনীতি ও নৈতিকতার একটি বিশাল জগত আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

৯৫. মূলে غُرْفَـهُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে উঁচু দালান। সাধারণত এর অনুবাদে "বালাখানা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকে একতলা বা দোতলা কক্ষের ধারণা মনের পাতায় ভেসে ওঠে। অথচ সত্য বলতে কি দুনিয়ায় মানুষ যতই বৃহদাকার ও উচ্চতম ইমারত তৈরি করুক না কেন এমন কি মানুষের অবচেতন মনে জান্নাতের ইমারতের যেসব নক্শা সংরক্ষিত আছে ভারতের তাজমহল ও আমেরিকার আকাশচুম্বী ইমারতগুলো (sky-scrapers)ও তার কাছে নিছক কতিপয় কদাকার কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়।

৯৬. অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করো, তার ইবাদাত না করো এবং নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য তাঁকে সাহায্যের জন্য না ডাকো, তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের কোন গুরুত্বই নেই। এ কারণে তিনি নগণ্য তৃণখণ্ডের সমানও তোমাদের পরোয়া করবেন না। নিছক সৃষ্টি হবার দিক দিয়ে তোমাদের ও পাথরের মধ্যে

কোন ফারাক নেই। আল্লাহর কোন প্রয়োজন পূরণ করতে হলে তোমাদের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তোমরা বন্দেগী না করলে তাঁর কোন কাজ ব্যাহত হবে না। তোমাদের তাঁর সামনে হাত পাতা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করাই তাঁর দৃষ্টিকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। এ কাজ না করলে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে ময়লা আবর্জনার মতো।